সাম্প্রতিক বিবেচনা

বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস

আহমদ ছফা

সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস

[প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭]

আহমদ ছফা

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-408-137-8

প্রকাশ কাল
ফেব্রুয়ারি ২০১১

কে এম ফিরোজ খান, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা-১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
মৌমিতা প্রেস ২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

কম্পিউটার কম্পোজ
রুকু শাহ্ কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ শিল্পী
মোবারক হোসেন লিটন

মূল্য : ১২৫.০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আততায়ীর গুলিতে নিহত
কবি হুমায়ুন কবির-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা : সাম্প্রতিক বিবেচনা

এক

'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ শ' বাহাত্তর সালে। এখন উনিশ শ' সাতানব্বই। এরই মধ্যে পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে। যখন লেখাটি প্রকাশিত হয় আমার বয়স বড়জোর আটাশ। বিগত পঁচিশ বছরে এই লেখাটির অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি স্নায়ুতন্ত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আমাকে এই লেখাটি লিখতে বাধ্য করেছিল। দৈনিক 'গণকণ্ঠ' পত্রিকায় সতেরটি কিস্তিতে আমি লেখাটা লিখি। পরে বই আকারে প্রকাশ করি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর লেখাটি নানা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন তরুণদের কাছে লেখাটি আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই পুস্তকে প্রকাশিত নানা মন্তব্য পাঠকদের মধ্যে এত সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল, সেকালে যাঁরা তরুণ ছিলেন তাঁদের কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেলে এই বইটির বিশেষ পংক্তি তাঁরা এখনো আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন।

এই রচনাটি লেখার পূর্বে বিশেষ ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ আমি পাইনি। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বেবাক রচনাটি লিখে ফেলেছিলাম। লেখার সময় কখনো মনে হয়নি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আশয় নিয়ে আমি সিরিয়াস একটা পর্যালোচনা হাজির করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। যেহেতু এ লেখাটি লিখতে আমাকে কোন বেগই পেতে হয়নি, তাই কি লিখলাম এ নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামাবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। আমার অন্যান্য রচনার পেছনে যে শ্রম, অভিনিবেশ এবং যত্ন আমাকে বিনিয়োগ করতে হয়েছে, তার ভগ্নাংশও এই রচনার পেছনে ব্যয় করতে হয়নি। তাই এ লেখার সঙ্গে আমার প্রাণের অনুভূতির সংযোগ অতটা নিবিড় নয়। যদি লোকসমাজে বিশেষভাবে আলোচিত না হত, হয়ত এই রচনাটির কথা আমিও ভুলে যেতে পারতাম। সৃষ্টিশীল আবেগের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হলেও এই রচনায় আমি এমন কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলাম, সমাজ এবং রাজনীতিসচেতন মানুষ সেগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। এই বইয়ের পাঠকেরাই আমাকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এ বইটি যেহেতু আমার কলম থেকে বেরিয়েছে সুতরাং গ্রন্থ প্রকাশিত মতামতের দায়-দায়িত্বও আমাকে বহন করতে হবে। এখানে আমি সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই, আমার সাধ্যমত সেই দায়-দায়িত্ব আমি বহন করেছি।

মাঝে মাঝে এমন চিন্তাও আমার মনে আসে, লেখাটি যদি না লিখতাম, হয়ত আমার জীবন অন্যরকম হতে পারত। এই লেখাটির জন্যই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর রোষ আমাকে পেছন থেকে অভিশাপের মত তাড়া করছে। অদ্যাবধি আমি জীবনে স্বস্তি কি বস্তু তার সন্ধান পাইনি। আগামীতে কোনদিন পাব, সে ভরসাও করিনে। তথাপি এই রচনাটি লেখার জন্য এক ধরনের গর্ব অনুভব করি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলোতে অবিচার, অনাচার, নির্যাতন, রাষ্ট্রশক্তির সক্রিয় হস্তক্ষেপ যখন সামাজিক বিবেকের কণ্ঠ রুদ্ধ করে ফেলেছিল, স্বৈরাচারের প্রবল প্রতাপে উদ্ধত অন্যায় যখন ন্যায়ের বসন পরে অসহায় সমাজের ওপর ভ্রুকুটি নিক্ষেপ করেছিল, রাজরোষের ভয়ে বিবেকবান মানুষ মূক হতবিহ্বল প্রচণ্ড শাসনের সেই নিষ্ঠুর পরিস্থিতিতে আমি জ্বলে উঠতে পেরেছিলাম। এটা অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ওঠার মত কিছু না হলেও নিতান্ত সামান্য বিষয় মনে করিনে। প্রতিটি দ্রোহ, প্রতিটি প্রতিবাদ, তার শাস্তির দিক যেমন আছে তেমন পুরস্কারেরও একটা ব্যাপার এতে রয়েছে। শাস্তির কথাটা বলেছি। এখন পুরস্কারের কথা বলি। ন্যায়ের পক্ষে যারা কথা বলে, কাজ করে মানবহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মানবোধ তাদের অভিমুখে ধাবিত হয়। এই ছিপছিপে গ্রন্থটি রচনা করার কারণে তরুণতর প্রজন্মের মনে আমি একটা স্থান করে নিতে পেরেছিলাম। এই লেখাটা নিয়ে পঁচিশ বছর আগে যেভাবে আলোচনা হত, এখনো নানা জায়গায় সেরকম আলোচনা হতে দেখি। সেই জিনিসটাকেই আমি পুরস্কার বলে ধরে নিয়েছি।

'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রকাশিত হওয়ার পর যখন সকলে লেখাটির তারিফ করতে থাকেন, আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকদের কেউ কেউ আগ্রহী হয়ে প্রতিবাদী বই-পুস্তক লিখতে আরম্ভ করেন। সেগুলো যদি যথার্থ দ্রোহ এবং প্রতিবাদ ধারণ করতে পারত তাহলে আমিই সবচেয়ে বেশি সন্তোষবোধ করতে পারতাম। অন্তত মনে করতে পারতাম আমি নেহাত অরণ্যে রোদন করিনি। আমার উত্তাপিত কণ্ঠস্বরে সাড়া দেয়ার লোক পাওয়া গেছে। আমি একা নই। কিন্তু আমাকে নিদারুণভাবে হতাশ হতে হয়েছে। এই ভদ্রলোকদের রচনাসমূহে বাকচাতুর্য আছে, কিন্তু প্রতিবাদের আগুন নেই। পণ্ডিতদের এই ধরনের ভাবের ঘরে চুরি করার কসরত দেখে দেখে আমি প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সম্মানের কাঙাল মানুষেরা কি ধরনের সামাজিক উৎপাতের কারণ হতে পারেন। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে যখন আমি 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসে'র সঙ্গে পরবর্তীকালে পণ্ডিতদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর তুলনা করি, কেন জানি আমার সেগুলোকে তাজা বোমার পাশে সার সার ভেজা পটকার মত মনে হতে থাকে। 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' রচনাটির প্রতি আমার অন্য এক বিশেষ কারণে একটা বিরক্তিবোধ রয়েছে। যথেষ্ট না হলেও সাহিত্যের নানা শাখায় অবশ্যই কিছু দাহিকাশক্তিসম্পন্ন রচনা আমি লিখেছি। এই সকল রচনায় আমার মনন, মেধা এবং শ্রমের অধিকাংশ ব্যয় করেছি। কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে আমার সাহিত্যকর্ম বলতে একমাত্র এই 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন

বিন্যাসে'র উল্লেখ করে থাকেন। যদিও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি, এই জিনিসটি আমাকে খুবই আহত করে। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করেছি, লোকে ওই লেখাটার কথা বলে কেন? আমার অন্যান্য রচনার কি কোন সাহিত্য মূল্য নেই? আমার অন্যান্য রচনাকে আড়াল করে রাখার জন্য এই বইটির প্রতি একটা চাপা নালিশ সবসময়ই পুষে আসছিলাম।

দুই

এই লেখার শুরুতেই জানিয়েছি 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ শ' বাহাত্তর সালে। এখন সাতানব্বই। মাঝখানে সিকি শতাব্দীর ব্যবধান। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কোন রকমের পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া লেখা একটি রচনা এই পঁচিশ বছর পরেও কতটা প্রাসঙ্গিক হতে পারে, বইটি পাঠ করতে গিয়ে নতুন করে টের পেলাম। বিশ্বাসই হতে চায় না যে রচনাটি আমি লিখেছিলাম। এই গ্রন্থে যে সকল মতামত প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো বাহাত্তর সালে যতটা প্রাসঙ্গিক এবং সত্য ছিল, এই সাতানব্বই সালে তাদের তাৎপর্য ক্ষুণ্ন না হয়ে বরং অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুখ্যত সে কারণেই নতুন একটি সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে নতুন একটি ভূমিকা লেখার প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারিনি।

সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে জাতীয় মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীরা সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এই রাষ্ট্রীয় চতুস্তম্ভের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে ফেলেছিলেন। রেডিও টেলিভিশনে তোষামোদ, চাটুকারিতা, নির্লজ্জ আত্মপ্রচার মানুষের সুস্থ কাণ্ডজ্ঞানকে একরকম মুছে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। সন্ত্রাস, গুম, খুন, ছিনতাই, দস্যুতা, মুনাফাখোরি, কালোবাজারি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্বিচার হত্যা এগুলো একান্তই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষের হনন প্রবৃত্তি, লোভ রিরংসার এরকম নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশের সিংহদুয়ার খুলে দেয়ার ব্যাপারে তৎকালীন সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই ধরনের একটি মাৎস্যন্যায় পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই একটি পালনীয় ভূমিকা ছিল, একটা দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তাঁরা সেদিন তাঁদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব-কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে যাবতীয় অমানবিক কর্মকাণ্ডে সরকারের মদদ দিয়ে নিজেদের আখের গুছাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সামগ্রিক পরিস্থিতির এরকম অবনতির বহুবিধ গভীরতর কারণ নিশ্চয়ই বর্তমান ছিল এবং সেগুলোর উৎসও ছিল জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। আমি চারদিকে যা ঘটছে খোলা চোখে দেখে প্রতিক্রিয়াগ্রস্ত হয়ে আমার শঙ্কা, সন্দেহ এবং ক্ষোভের অভিব্যক্তি ছাপার হরফে প্রকাশ করেছিলাম। আমি যা লিখেছিলাম, তার একটা বাক্যও আমাকে গবেষণা করে আবিষ্কার করতে হয়নি। আমার চারপাশে যা ঘটছে তা দেখে চারপাশের মানুষের মুখের কথা শুনে আমার বয়ানটুকু তৈরি করেছিলাম।

আমার মনে হয়েছিল এ অবস্থা চলতে পারে না, এই মিথ্যার পাহাড় এক সময়ে ধসে পড়তে বাধ্য। আমি এই বইটিতে যে সকল সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলাম, তার প্রতিটি বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।

শেখ মুজিবুর রহমান বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথ পরিহার করে একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা আরোপ করলেন এবং সর্বময় ক্ষমতার কর্তা হয়ে বসলেন। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ এই চারটি প্রতীতিকে জাতীয় মূলনীতি হিসেবে নির্ধারণ করলেন বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেগুলো একদলীয়, আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে এক ব্যক্তির শাসন ত্রাসনের হাতিয়ারে পরিণত হল। তার মর্মান্তিক পরিণতি এই হল যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নিহত হতে হল। রাষ্ট্রক্ষমতা বেসামরিক একনায়কের হাত থেকে সামরিক একনায়কের হাতে হস্তান্তরিত হল। একের পর এক সমরনায়কেরা সমাজের পাতাল প্রদেশ থেকে পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা, ধর্মান্ধতা শুধু জাগিয়ে তুলে ক্ষান্ত হননি, সেগুলোর আইনগত স্বীকৃতি দান করে আমাদের জাতীয় জীবনের গন্তব্য অধিকতর ধোঁয়াটে এবং কুয়াশাচ্ছন্ন করে তুলেছেন। স্বাধীনতার শুরু থেকেই বুদ্ধিজীবীরা একজোট হয়ে শেখ মুজিবের অগণতান্ত্রিক একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে যদি রুখে দাঁড়াতেন তাহলে আমাদের জাতিকে এতটা পথ পশ্চাৎ প্রত্যাবর্তন করতে হত না। যে-কোন দেশের বুদ্ধিজীবীরা যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অসম্মত হন সেই দেশটির দুর্দশার অন্ত থাকে না। বাংলাদেশ সেইরকম একটি দুর্দশাগ্রস্ত দেশ। এই দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উদ্যোগ, কোন প্রয়াস কোথাও পরিদৃশ্যমান নয়।

বর্তমানে সরকার সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা যে ভূমিকাটি পালন করছে, তা কিছুতেই বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে আওয়ামী বাকশালী বুদ্ধিজীবীরা যে কাপুরুষোচিত ভূমিকা পালন করছে, তার চাইতে বেশি আলাদা নয়। তাঁদের কথা-বার্তা শুনে মনে হয় বাহাত্তর-তিহাত্তর সাল থেকে টাইম মেশিনে চড়ে তাঁরা এই সাতানব্বই সালে পদার্পণ করেছেন। বাহাত্তর সালে তাঁরা যেভাবে যে ভাষায় অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলতেন বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলতেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি অঙ্গীকার প্রকাশ করতেন; এই সাতানব্বই সালেও তাঁরা একই ভাষায় সেই পুরনো বুলিগুলো উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে তাঁদের কণ্ঠস্বর এখন অধিকতর দ্বিধা এবং জড়িমাহীন। অনেকটা স্বৈরাচারী অবস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁরা এই প্রত্যয়সমূহ উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। সাজানো মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইনেভোগী নট-নটীর মত সেই পুরনো কথা বলে যাচ্ছেন তাঁদের কণ্ঠস্বর থেকে অনুভব কিংবা উপলব্ধির কোন তড়িৎ সঞ্চারিত হয় না। তাঁদের উচ্চারণ থেকে কোন গাঢ় প্রত্যয়ের দীপ্তি জনমানসে বিকিরিত হয় না।

বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীভুক্ত এই ভাড়াখাটা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সকলের না হলেও কারো কারো অল্প-স্বল্প শৈল্পিক অঙ্গীকার এবং সামাজিক সুকৃতি ছিল। কিন্তু শাসক দলের চাল-কলা খেকো বামুনের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাঁদের সমস্ত

অঙ্গীকার এবং সুকৃতি প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছেন। বর্তমানে তাদের অবস্থা অনেকটা 'জয় জয় করিয়া বাড়ে রাজার ব্রাহ্মণের' মত। সরকারি বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ একসময়ে শিল্পকলার নানাবিষয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সরকারি সুবিধার বলয়ে প্রবেশ করার পর সর্বত্র তাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। প্রদর্শন করার যতগুলো মাধ্যম আছে সবখানে তাঁদের পবিত্র মুখমণ্ডল আলো করে জ্বলতে থাকল। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় অমৃতবর্ষী বাণী ছড়িয়ে দিতে লেগে গেলেন। সরকারি প্রচারযন্ত্রের অংশে পরিণত হওয়ার পর এই সকল সৃষ্টিশীল মানুষ সম্পূর্ণরূপে সুকুমার অনুভূতি এবং কল্পনাশক্তি রহিত রোবটে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের অবস্থা দলীয় ক্যাডারের চাইতে অধিক শোচনীয়। কারণ ক্যাডারের কাজ চিন্তা করা নয়, নেতা বা দলের হুকুম তামিল করা। কিন্তু একজন বুদ্ধিজীবীকে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু চিন্তার বদলে যদি তিনি চিন্তা করার ভান করেন, পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। তাই সরকারি বুদ্ধিজীবীরা যখন বলেন আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধন করছি, তাঁদের এই উচ্চারণগুলো সত্য বলে মেনে নেয়ার কোন যুক্তি নিজেরাও দাঁড় করাতে পারবেন না। সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন বলেই যত্রতত্র তাঁরা তোতা পাখির মত এ বুলিগুলো উচ্চারণ করছেন। তাঁদের রচনার মধ্যেই মানসিক বন্ধ্যাত্বের চিহ্ন যে কেউ খুঁজে বের করতে পারেন। তাঁরা যখন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কথা বলেন শুনে মনে হবে, আবাহনী মোহামেডান টিমের ভাড়া করা বিদেশি খেলোয়াড়দের মত তাঁদেরও ভাড়া করে আনা হয়েছে। তাঁরা যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলেন শুনে মনে হবে, টেক্সট বই থেকে কথাগুলো মুখস্থ করে হাজেরান মজলিশের শ্রোতাদের সামনে বমি করে দিচ্ছেন। তাঁরা যখন মৌলবাদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার তোলেন, সেটাকে গোদা পায়ের লাথির সঙ্গে তুলনা করা যায়। হুঙ্কার দিয়ে কি মৌলবাদ প্রতিরোধ সম্ভব? তাঁদের মধ্যে স্বচ্ছ চিন্তা কোথায়? চিন্তার সমর্থনহীন ঢোলা উচ্চারণ এবং শোরগোল কি মৌলবাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিষেধক বিবেচিত হতে পারে? এই সকল বুদ্ধিজীবীদের অতীত অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং কলঙ্কিত। পাকিস্তান আমল থেকেই রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় তাঁরা ননী-মাখন লুট করে এসেছেন। তাঁদের অতীতদিনের কর্মকাণ্ড ঘেঁটে আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা হলে যে কেউ বুঝতে পারবেন তারা কিছুতেই আমাদের জনগণের বন্ধু হতে পারেন না। তাঁদের উচ্চ কণ্ঠে চিৎকারের মধ্যদিয়ে নির্লজ্জ সুবিধাবাদ ছাড়া অন্যকোন প্রত্যয়ই ধ্বনিত হয় না। বাহাত্তর সালে তাঁরা যা করেছেন, অধিক জোরের সঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন মাত্র।

বাহাত্তর সাল আর ছিয়ানব্বই সাল এক নয়। বাহাত্তর সালে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মৌলবাদের অবস্থান ছিল তখন টলটলায়মান। এখন প্রতিক্রিয়ার শক্তি অনেক বেশি সুসংহত এবং সংগঠিত। মৌলবাদ অক্টোপাশের মত ক্রমাগতভাবে আমাদের সমাজকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করে ফেলছে। যাঁরা মৌলবাদী তারা শতকরা একশ ভাগ মৌলবাদী। কিন্তু যাঁরা প্রগতিশীল বলে দাবি করে থাকেন তাঁদের কেউ কেউ দশ ভাগ প্রগতিশীল, পঞ্চাশ ভাগ সুবিধাবাদী, পনের

ভাগ কাপুরুষ, পাঁচ ভাগ একেবারে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। এই রকমের একটি সমীকরণের মধ্যে ফেললে বর্তমান সরকারদলীয় বুদ্ধিজীবীদের চিহ্নিত করা সম্ভব। দিনে দিনে প্রতিক্রিয়ার শক্তি যে হারে সংহত হচ্ছে এবং মৌলবাদের প্রতাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা তার বিরুদ্ধে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধই রচনা করতে পারেননি। আমাদের জনগণ তাঁদেরকে চরিত্রহীন, ভ্রষ্ট, সুযোগ-সন্ধানী এবং আগ্রাসীশক্তির সহায়ক হিসেবে এরই মধ্যে চিহ্নিত করে ফেলেছেন। মুখে তাঁরা যা-ই বলুন না কেন, আমাদের জনগণকে মুক্তির দিগন্তে পরিচালিত করার কোন অনুপ্রেরণা তাঁরা দিতে পারেন না যেমন তেমনি আমাদের জাতিকে আপন মেরুদণ্ডের ওপর থিতু হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার কোন কর্মপন্থার নির্দেশ করতেও তাঁরা সত্যি সত্যি অক্ষম। সরকার সমর্থক বুদ্ধিজীবীরাই দেশের একমাত্র বুদ্ধিজীবী নন। যে সকল বুদ্ধিজীবী প্রধান বিরোধীদলটির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে মাঠে-ময়দানে হুঙ্কার তুলেছেন, যখন তখন যে-কোন উপলক্ষে জমায়েত হচ্ছেন, ভাগে কম পড়ার বেদনাই চিৎকার করে তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদের মনন এবং চিন্তা পদ্ধতি আরো সেকেলে, আরো ভয়ানক। সরকারি বুদ্ধিজীবীদের সামনের দিকে তাকানোর সাহস নেই। কিন্তু এই সকল বুদ্ধিজীবীদের চোখ এবং পা দুই-ই পেছনের দিকে ফেরানো। এককথায় রাষ্ট্রযন্ত্রের এ-পাশে ও-পাশে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীর অবস্থান তাঁরা জাতি এবং সমাজকে কিছু দেন না বরং গবাদি পশুর গায়ের এঁটুলি পোকার মত সমাজের মানুষের রক্তপান করে নিজেরা মোটা-তাজা হতে থাকেন।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল এবং ছদ্মবেশী প্রগতিশীল এই উভয় গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে না পারলে আমাদের দেশে প্রগতিশীল সংস্কৃতি এবং রাজনীতির উত্থান অসম্ভব। আমাদের দেশের প্রগতিশীল রাজনীতির যে অবস্থা তার সঙ্গে খাটে শোয়া মুমূর্ষু রোগীর তুলনা করা চলে। যার অস্তিত্ব আছে বলে শোনা যায়, কিন্তু তার নড়াচড়া নেই। বামপন্থী রাজনীতির এই করুণ পলায়মান এবং জরাজীর্ণ দশা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ দুর্ভাগ্যেরই ইঙ্গিত নির্দেশ করে। সুতরাং বর্তমান অবস্থা থেকে প্রগতিশীল রাজনীতি এবং সংস্কৃতিকে উঠে আসতে হলে ছদ্মবেশী প্রগতিশীল এবং মৌলবাদী উভয় গোষ্ঠীকেই পরাজিত করতে হবে। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। এই সময়ের মধ্যে আমাদের সমাজ অনেক জটিল হয়ে পড়েছে, বিরাজমান রাজনীতি, অর্থনৈতিক সংগঠন, রাষ্ট্রের চেহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় সামাজিক বদ্ধমত এবং সংস্কারের অনেক কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সংগ্রামের গতিপথটি ছকিয়ে নিতে হবে। যে সকল বিষয় পঁচিশ বছর আগে স্পর্শ করার প্রয়োজন বোধ করিনি, নতুন একটি সংস্করণ প্রকাশ করার সময় সে বিষয়গুলো নতুন করে শনাক্ত করার চেষ্টা করছি।

তিন

'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসে' তৎকালীন রাজনীতির ভাল-মন্দ সম্পর্কে কোন আলোচনাই করা হয়নি। কারণ এ ব্যাপারে আমার মনে সংশয় ছিল। সেই পরিবেশ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের চরিত্র আলোচনার সুযোগও ছিল না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির চরিত্র কি হবে জন্মলগ্নে তার একটি পরিচয় নির্ণয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এ চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজের বাস্তব অবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শের ফাঁকা বুলির মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ এত অধিক ছিল যে এক বছর সময়ের মধ্যেই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল, এ জিনিস চলবে না, চালানো যাবে না। একটা বিপত্তি ঘনিয়ে আসছে। বাতাসে আমি তার গন্ধ শুঁকেছিলাম। কার্যকারণ সম্পর্ক বিচারের অবকাশ হয়নি। একজন লেখক হিসেবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই সমূহসর্বনাশের সংকেত আমার মনে জ্বলে উঠেছিল।

পরবর্তীতে অল্পদিন না যেতেই দেখা গেল শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান পরিবর্তন করে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর স্থলে রাষ্ট্রপতি হয়ে বসলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের পন্থা পরিহার করে একদলীয় শাসন কায়েম করলেন। তারপর মুজিবের শাসন তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি সপরিবারে মর্মান্তিকভাবে নিহত হলেন। একজন বা একাধিক ব্যক্তির হত্যার মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রের পরিচয় পাল্টে যাওয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অধিক নেই। অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারটিই ঘটেছে। সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার এই প্রত্যয় দুটো সংবিধান থেকে ঝরে পড়ল। বেশ কিছুদিন সামরিক শাসন চালু থাকার পর জিয়াউর রহমান যখন পুনরায় বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, সংবিধানের শিরোভাগে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" এসে স্থান করে নিল। রাষ্ট্রের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। জিয়াউর রহমানের পর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এসে ইসলাম ধর্মকে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে বসলেন।

মুজিব-পরবর্তী বাংলাদেশের শাসকবৃন্দ ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মধ্যে যেমন পরিবর্তন এনেছেন, তেমনি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা এগুলো ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার প্রক্রিয়া চালু করেন। জিয়াউর রহমান তাঁর শাসনামলে শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেয়ার প্রক্রিয়াটি শুরু করেন। এরশাদের আমলে এসে সেই প্রক্রিয়াটিই অত্যন্ত জোরে-শোরে অনুসৃত হতে থাকে। সামরিক শাসক এরশাদের পতনের পর জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে খালেদা এলেন। খালেদাকে পরাজিত করে হাসিনা। এই বারংবার ক্ষমতার হাত বদলের মধ্যেও রাষ্ট্রীয় পুঁজি ব্যক্তির হাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াটি প্রতিটি নতুন সরকারের আমলে অধিকতর বেগবান হয়েছে। বর্তমান শেখ হাসিনার আমলেও যে অল্প-স্বল্প পুঁজির নিয়ন্ত্রণভার সরকারের হাতে আছে, ব্যাংক-বীমা ইত্যাকার যে প্রতিষ্ঠানগুলোর

মালিক খোদ সরকার, সেগুলো ব্যক্তি মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এই সমস্ত আন্তর্জাতিক অর্গলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান নিরন্তর চাপ প্রয়োগ করে আসছে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির আসল স্বরূপ নিয়ে যে বিতর্ক সাম্প্রতিককালে কতিপয় জাতীয় প্রতীককে ঘিরে ঘনীভূত হয়েছে মোটা দাগে সেগুলো এরকম। জাতি হিসেবে বাংলাদেশিদের পরিচয় কি হবে? বাঙালি না বাংলাদেশি? বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের পরিচয় মুসলমান না বাঙালি? বাংলাদেশিরা জয়বাংলা বলবে না বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলবে, শেখ মুজিবুর রহমান যাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সংগ্রাম ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ লাভ করেছে, কোন পরিচয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা হবে? তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি? নাকি বাঙালি জাতির জনকের অভিধায় চিহ্নিত হবেন? বর্তমান বাংলাদেশের দুটি প্রধান দল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এই সমস্ত প্রতীকের মধ্যেই তাঁদের অন্তর্গত বৈপরীত্য এবং মতাদর্শগত বিরোধ সন্ধান করছে। যে প্রতীকগুলো দিয়ে দুটি প্রধান দলের মধ্যে বিরোধ বিসংবাদ চলছে, সেই প্রতীকগুলোর ভাবার্থ এবং গভীর ব্যঞ্জনা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখলে কোন বৈপরীত্য আবিষ্কার করা সত্যি সত্যি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আমরা বাঙালি একথা যেমন সত্য, তেমনি আমাদের বাংলাদেশি পরিচয়ও মিথ্যা নয়। সংখ্যাধিক জনগোষ্ঠীর মুসলমানিত্বের পরিচয় বাঙালিত্বের পরিচয় খারিজ করে না। জয়বাংলা এবং জিন্দাবাদ শব্দটির মধ্যে অর্থগত কোন বিরোধ না থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় জয়বাংলা শব্দবন্ধটি একটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছিল, সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যেহেতু আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃত্বের দাবিদার, সেই সুবাদে জয়বাংলা শব্দবন্ধটি তাঁরা একচেটিয়াভাবে ব্যবহার করে থাকেন। অন্যকোন ব্যক্তিবর্গ যদি আওয়ামী লীগ বিরোধী একটি রাজনৈতিক সংগঠন দাঁড় করিয়ে জয়বাংলা শব্দটিকে ব্যবহার করতে থাকেন, আওয়ামী লীগের তরফ থেকে আপত্তি উত্থাপন করার কোন কারণ কি থাকতে পারে? যদি বাংলাভাষার শব্দ হওয়ার কারণে জিন্দাবাদের বদলে জয়বাংলার গ্রহণযোগ্যতা অধিক হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আওয়ামী লীগ শব্দবন্ধটিও বাংলা নয়। আওয়ামী শব্দটি উর্দু এবং লীগ শব্দটি ইংরেজি। তারপরে শেখ মুজিবুর রহমানের কথা ধরা যাক। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি না বাঙালি জাতির জনক? মুজিবকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে মেনে নিলে কারো কোন বিতর্কের অবকাশ থাকে না। কিন্তু তাঁকে বাঙালি জাতির জনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে আরো একটি প্যাঁচালো বিতর্কের জন্ম দেয়া হয় মাত্র। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের নানা জায়গায় বাঙালিরা বসবাস করে থাকেন। তাঁরা শেখ মুজিবকে বাঙালি জাতির জনক হিসেবে মেনে নিতে স্বীকৃত হবেন না। প্রকৃত অর্থে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ভূখণ্ডটিই স্বাধীন হয়েছে। তাঁকে যদি জাতির জনক হিসেবে মেনেও নিতে হয়, বাংলাদেশি জাতির জনক বলাই অধিকতর সঙ্গত।

তাই যদি হয়, তাহলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার দাবিই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় নাকি? বাংলাদেশি বলে কোন জাতি যেমন নেই, তেমনি কোন পিতাও থাকতে পারে না।

উনিশ শ' একাত্তরের মুক্তি-সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে নতুন একটি রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে তার ভেতরের যে সংকট তার সঙ্গে সাম্প্রতিককালে দুটি প্রধান দলের মধ্যে যে প্রতীকী বিরোধ চলছে তার সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ। আসলে যাহা জল তাহাই পানি। বাংলার হিন্দুরা পানিকে জল বলে। আর বাংলার মুসলমানেরা জলকে পানি বলে। আবার বাংলার বাইরে হিন্দু মুসলমান সবাই জলকে পানিই বলে থাকে। 'পানি' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে। জল বাংলা শব্দ। জল ও পানির মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। তারপরেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ জল অথবা পানি শব্দ দুটো উচ্চারণের মধ্যদিয়েই প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। সংকটের আসল এলাকাকে পাশ কাটিয়ে প্রতীকের মধ্যে বিরোধ আবিষ্কার করার প্রবণতার কারণ-বীজ বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির জন্ম প্রক্রিয়ার মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদান করার কৃতিত্ব দাবি করে থাকে। দলটির এ দাবি একটুও অসঙ্গত নয়। তা সত্ত্বেও একথাটি অসত্য নয়, যে সমস্ত নেতা আওয়ামী লীগের জন্ম প্রক্রিয়াটি সূচিত করেছিলেন, তাঁরা সকলেই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বদান করেছিলেন। আওয়ামী লীগের প্রধান স্থপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবুর রহমান এই তিন ব্যক্তিত্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের কাছ থেকে ন্যায্য অংশ আদায় করার দাবিতে তাঁরাই আবার আওয়ামী লীগ সংগঠনটি দাঁড় করিয়েছেন। আপোস-আলোচনার মাধ্যমে ন্যায্য দাবি আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল বলে, আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে।

নির্মোহভাবে দৃষ্টিপাত করলে একটা বিষয় সকলের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতির মধ্যে যে সকল চিন্তা-চেতনা ক্রিয়াশীল সেগুলোকে অতীতের পাকিস্তানি রাজনীতির জের কিংবা সম্প্রসারণ বলে অভিহিত করলে খুব বেশি অন্যায় হবে না। মুসলিম লীগের বীজতলা থেকেই আওয়ামী লীগের জন্ম এবং দলটি মুসলিম লীগের রাজনীতির বেসামরিক ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। যতদিন পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে একটি মধ্য শ্রেণীর বিকাশ হয়নি, আওয়ামী লীগের সমর্থন এবং আনুগত্য কম্পাসের কাঁটার মত পশ্চিমের দিকে হেলে থাকত। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর উত্তরাধিকার ধারণ করছে একথা বললেও খুব একটা মিথ্যা বলা হয় না। যদিও এরই মধ্যে দলটিতে অনেক নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে, তথাপি জন্ম প্রক্রিয়ার সেই প্রাথমিক বোধগুলো এখনো সক্রিয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যে উৎস থেকে জন্ম লাভ করেছে, সেই একই উৎস থেকে

জাতীয় পার্টিরও উদ্ভব। তারতম্যের পরিমাণ নির্ভর করছে অন্যান্য সামাজিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ওপর। বাংলাদেশটির দুর্ভাগ্য হল এই যে, দেশটির প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে বিপুল পরিমাণ অতীতের দায়ভার বহন করতে হচ্ছে। অতীতের ভূত কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে বর্তমানের নিরিখে কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করার কোন লক্ষণ পরিদৃশ্যমান হচ্ছে না। অতীতের ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই তাঁরা দেশটা শাসন করতে চান। তাই প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলের আচরণের মধ্যে ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য এতটা প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, তার মধ্যে বাংলাদেশ কতটা উপস্থিত সেই জিনিসটিই দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের যে একটি আত্মা আছে, তা আবিষ্কার করতে সক্ষম নয়। সে কারণে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসগত বিভেদ পাশ কাটিয়ে শব্দ বা শব্দবন্ধ নিয়ে কলহ করে সময় যাপন করে থাকেন।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি জন্মাবার পেছনে ধারণাগত একটা ভ্রান্তি অদ্যাবধি প্রবলভাবে বিরাজমান। বলা হয়ে থাকে, ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতর থেকে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার দাবিতে এই রাষ্ট্রটির উত্থান হয়েছে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্ম সুনিশ্চিত করেছিলেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি মুসলমান ও হিন্দু দুটি আলাদা জাতি, এই প্রত্যয়টি খারিজ করে দিয়ে জন্ম লাভ করেছে। শুধু এটুকু যদি বলা হয় সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না। একটু ইতিহাসের পেছনে যাওয়া প্রয়োজন। এক সময়ে ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলমান একটি রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বসবাস করতে সম্মত হয়নি বলেই ভারত এবং পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম সম্ভাবিত হয়েছে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ দাবি করেছিলেন, ভারতের মুসলমানেরা নিজেরাই আলাদা একটি জাতি। সুতরাং একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি পাকিস্তান প্রয়োজন। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতা দাবি করেছিলেন, ভারতের সব সম্প্রদায়ের জনগণ মিলেই একটি জাতি। সুতরাং ভারতকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ করা কখনো উচিত হবে না। তারপরেও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি পাকিস্তানকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। সিকি শতাব্দীর মধ্যেই পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি জন্ম নিল। জিন্নাহ্ সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা হয়ে গেল। কথাটি এতই দিবালোকের মত সত্য যে, এ নিয়ে আর কোন তর্ক চলতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময়ে ভারতের কংগ্রেস দলীয় তাত্ত্বিকেরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই মতাদর্শগত ভিত্তিটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডার ধরনটি থেকে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে এসেছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সকল ভারতীয় জনগণের একজাতিত্বের যে দাবি তুলে ধরেছিল, বাংলাদেশের জন্মের মধ্যদিয়ে সেই জিনিসটিই আবার নতুন করে প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলটির অনুসারী শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের

বেশিরভাগই বাংলাদেশের জন্মকে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রম সংশোধন বলে ব্যাখ্যা করে আসছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটির মধ্যে একটা শুভঙ্করের ফাঁক বরাবরই থেকে যাচ্ছে। অবশ্যই প্রশ্ন করা প্রয়োজন, ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুটি জাতি আলাদা এটা যেমন সত্য নয়, তেমনি সত্য নয় ভারতের সব জাতি মিলে এক জাতি। কংগ্রেস তাত্ত্বিক এবং তাঁদের বাংলাদেশি সাগরেদদের ব্যাখ্যা মেনে নিলে বাংলাদেশের একটা রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। ভারতের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াই বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক নিয়তি। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই অবচেতনে হলেও এই ব্যাখ্যাটি সত্য বলে মনে করে থাকেন। তাই তাঁদের মধ্যে এমন একটা ভারতমুখীনতা লক্ষ্য করা যায়, যার অর্থ পরিষ্কার এরকম দাঁড়াবে— বাংলাদেশ রাষ্ট্র একটি খণ্ডকালীন অস্তিত্ব মাত্র।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের মানচিত্রে বারবার অদলবদল ঘটেছে। যদি আরেকবার ঘটে তাতে বাধা কোথায়? একই রকম ভাঙচুর বাংলার মানচিত্রেও ঘটেছে। আরেকবার যে ঘটবে না, সে কথা জোর করে বলার উপায় কি? কিন্তু প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করলে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম জবাব শোনার জন্য তৈরি থাকতে হবে। ভারতের বাঙালি, পাঞ্জাবি, উড়িয়া, বিহারি, কাশ্মিরি, আসামি সকলে মিলে কি একটা জাতি? ভারতীয় যে অধিজাতিত্বের ধারণা ব্রিটিশ বিদায়ের প্রাক্কালে তৈরি করা হয়েছিল, সেটা কি এখন ধোপে টেকে? পাঞ্জাব, কাশ্মির, আসাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল এই সকল রাজ্যে একসার অগ্নিগিরির মত স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে জনগণের সংগ্রাম যেভাবে প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়েছে, সেটা কি সমস্ত ভারতীয় জনগণের এক জাতিত্বের প্রতি আনুগত্যের পরিচায়ক? ভারতের রাষ্ট্রনায়কেরাও আত্মবিশ্বাস সহকারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে অক্ষম, ভারত একজাতি হিসেবে চিরকাল অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসে। ভারতবর্ষ শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির দেশ যেমন নয়, তেমনি একজাতির দেশও নয়। বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু বর্ণ, বহু ধর্ম, অঞ্চল এবং নানা জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি হিসেবে ইতিহাসের শুরু থেকেই তার অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে। ব্রিটিশ বিদায়ের প্রাক্কালে দুর্বলতর জাতি, সম্প্রদায় এবং জনগোষ্ঠীগুলো তাদের দাবি উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারেনি বলেই একটি জগদ্দল রাষ্ট্রের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে সবাইকে ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না, কাঠামোতেই টান লাগছে।

উনিশ শ' বাহান্ন থেকে শুরু করে একাত্তর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের যতগুলো আন্দোলন হয়েছে, যত ধরনের গণ-সংগ্রাম রচনা করেছে তার একটা ইতিবাচক প্রভাব ভারতের নির্যাতিত অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠীর ওপর অনিবার্যভাবে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের উনিশ শ' বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের পরে আসাম, অন্ধ্র ইত্যাদি অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের পাঞ্জাব এবং

কাশ্মিরের মত বিচ্ছিন্নতাকামী রাজ্যসমূহের জনগণের ভারত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রেরণার উৎস হিসেবে ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে।

একটা বিষয় শুরু থেকেই পরিষ্কার করে নেয়া প্রয়োজন। নানা অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে ভারত উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচাইতে আধুনিক রাষ্ট্র। ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রে বাংলাদেশের উত্থান আধুনিক ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে অভিনব ঘটনা। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের আদর্শ উর্ধ্বে তুলে ধরে তাবৎ ভারত উপমহাদেশের অবহেলিত অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং দিনে দিনে সে প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উত্থান স্বীকার না করে যাঁরা শুধুমাত্র জিন্নাহ্ সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভ্রম সংশোধনকেই বাংলাদেশের জন্মের কারণ মনে করেন; জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এমন একটা ভ্রান্তির মধ্যে নিজেদের নিক্ষেপ করেন, চূড়ান্ত বিচারে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই একটা খণ্ডকালীন ব্যাপার বলে মেনে নিতে তাঁরা কদাচিৎ দৃষ্টভঙ্গিগত বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন। বাংলাদেশ ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রের গন্তব্যটি দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদের জনগোষ্ঠীর মনে অনপনেয়ভাবে গেঁথে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' লেখাটিতে একটি বিশেষ প্রান্তিক জাতিসমূহের ওপর যে নির্যাতন নিপীড়ন চলে আসছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমি হাজির করেছিলাম। সাম্প্রতিক বিবেচনা যখন তৈরি করছি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের সংগ্রাম একদিকে যেমন একটি দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের আকার পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে শক্তিশালী প্রতিবেশীর আগ্রাসী তৎপরতার বিষয়বস্তুতেও পরিণত হয়েছে। শুরুতে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার স্বীকার না করার মনোভাব থেকেই এই সঙ্কটের জন্ম হয়েছে। আসলে আমাদের নিপীড়িত জনগণের জীবনের যে মূল সঙ্কট, উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্কট তার চাইতে খুব একটা বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁদের বিশেষ বিশেষ অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে তাঁদের আস্থা অর্জন করার এখনই প্রকৃষ্ট সময়। বিলম্বে অনর্থপাত ঘটে যেতে পারে।

চার

অর্থনীতি রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। রাজনীতির চেহারাটি কি দাঁড়াবে নেপথ্যে অর্থনীতিই নির্ধারণ করে দেয়। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির দিকচিহ্নহীনতা এবং গণবিরোধী চরিত্র সেটাকে বাংলাদেশের অচলবন্ধ্যা অর্থনীতির যথার্থ প্রতিফলন বললে খুব বেশি বলা হয় না। অনড় স্থবির গতিহীন অর্থনীতিই রাজনীতিতে ক্রমাগত সংঘাত ডেকে আনছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এমন একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে আটকা পড়ে আছে, সেখান থেকে উত্তরণের কোন সম্ভাবনা পরিদৃশ্যমান নয়।

বাংলাদেশের জনগণ মুখ্যত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার তাগিদেই মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষকগোষ্ঠী পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ করে পাকিস্তানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে বিস্তর। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতিতে উন্নয়নের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। এখানকার আদিম কৃষিনির্ভর অর্থনীতির কোন রূপান্তর ঘটানো হয়নি একথা যেমন সত্য, তেমন পূর্বাঞ্চলের কৃষিপণ্যের থেকে মুনাফা অর্জন করে পশ্চিমারা তাদের অঞ্চলে সম্পদের পাহাড় গড়েছে তাও সত্য। এখানে কলকারখানা স্থাপন করা হয়নি, শিল্পবাণিজ্য বিকশিত করে তোলার সুচিন্তিত পদক্ষেপ কখনো গ্রহণ করা হয়নি। একটি কৃষিভিত্তিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকাঠামো প্রয়োজন, সে ব্যাপারে একেবারেই নজর দেয়া হয়নি। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে অল্প-স্বল্প যে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল, সেগুলোর মালিক ছিলেন পশ্চিমারা। পূর্বাঞ্চলের সস্তা কাঁচামাল এবং শ্রমিকের স্বল্প মজুরির ওপর নির্ভর করে পশ্চিম-পাকিস্তানের শিল্পপতিরা নিজেদের সহজ মুনাফা আয় করার তাগিদেই এই অঞ্চলে কিছু কিছু শিল্প-কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এইসব শিল্প-কারখানার লভ্যাংশ এই অঞ্চলে বিনিয়োজিত না হয়ে পশ্চিমে চলে যেত। পাকিস্তানের বাইশটি প্রধান পুঁজিপতি পরিবারের মধ্যে মাত্র একটিই ছিল পূর্বাঞ্চলে। পাকিস্তানে যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ এবং সাহায্য পশ্চিমের ধনী দেশগুলো থেকে আসত, তার সিংহভাগ ব্যয় করা হত পশ্চিম-পাকিস্তানে। সুফল যেটুকু, ভোগ করত পশ্চিমারা। পূর্ব-পাকিস্তানকে বইতে হত বৈদেশিক ঋণের দায়ভাগ। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিমাদের এই অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ করেছেন, আন্দোলন করেছেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করা যখন অসম্ভব বলে মনে হয়েছে, তখনই পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য স্বতন্ত্র একটা অর্থনীতি নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করে রাজনৈতিক সংগ্রামে নেমেছেন : মূলত আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচি ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের একটা স্বতন্ত্র অর্থনীতি নির্মাণের দলিল। পশ্চিমারা বরাবরই এই ন্যায্য অধিকারের দাবিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। সত্তরের নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ ছয়দফার পক্ষে আওয়ামী লীগকে ভোটের মাধ্যমে নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী করলেও পশ্চিমারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি হয়নি। অধিকন্তু পশ্চিমা সামরিক জান্তা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের প্রতিরোধের ব্যূহ চুরমার করে ফেলার জন্য রাতের অন্ধকারে তৎকালীন নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বসেছে। পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার ফলে পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা করার শেষ সম্ভাবনাটির অবসান ঘটল এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণকে একটি অসম যুদ্ধ ঘাড়ে করে নিতে হল।

একাত্তরেবর মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সঠিক বিশ্লেষণের জন্য পেছনের ইতিহাসটুকু জানা অবশ্যই প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে

বিজয় অর্জন হওয়ার পরে যে রাষ্ট্রটি বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করল, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রকেও সে রাষ্ট্রের একটা মূল স্তম্ভ বলে ঘোষণা করা হল। বাংলাদেশে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করার পূর্বশর্তসমূহ হাজির ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি আওয়ামী লীগ তেমন দলও ছিল না। তথাপি আওয়ামী লীগ সরকার সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় প্রধান নীতিমালার একটি হিসেবে ঘোষণা দিল এবং একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হল।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তি মালিকানার দখল থাকে না, সেগুলো সামাজিক মালিকানার ওপর ছেড়ে দিতে হয়। বাংলাদেশে উল্লেখ করার মত বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা ছিল না, যেগুলোও বা ছিল, মালিক ছিল অবাঙালি পশ্চিমা পুঁজিপতিরা। তাঁরা দেশ ছেড়ে কল-কারখানা ফেলে পাকিস্তানে চলে গেছেন। উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য বাধ্য হয়েই সরকারকে এই শিল্প-কারখানা-সমূহের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। শেখ সাহেব অনুপস্থিত পশ্চিমা মালিকদের শিল্প-কারখানা অধিগ্রহণের কর্মটিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ বলে ঘোষণা দিলেন। বিষয়টির ব্যাপকতা প্রমাণ করার জন্য বাঙালি মালিকের কিছু কিছু কল-কারখানার দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করলেন। আওয়ামী লীগ সরকার দলীয়ভাবে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে এই সমস্ত কল-কারখানার দায়িত্ব নিয়োজিত করলেন। রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা ছাড়া তাঁদের শিল্প-কারখানা চালানোর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা যোগ্যতার বালাই ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা শিল্প-কারখানার মধ্যে কোন রকম শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার বদলে অধিকতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলেন। তাঁদের নামে অভিযোগ উত্থাপিত হতে আরম্ভ হল, তাঁরা কারখানার যন্ত্রাংশ বেঁচে দিচ্ছেন, কাঁচামাল পাচার করে ফেলছেন। তার নীট ফল এই দাঁড়াল যে উৎপাদন কিছুতেই পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না। কোথাও পরিচালনার ত্রুটিতে, কোথাও কাঁচামালের অভাবে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যেতে আরম্ভ করল। রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে অর্থ ধার করে শ্রমিকদের মাইনে মাসের পর মাস পরিশোধ করতে হল। এই সময়টা ছিল শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সরকারের জন্য কঠোর অগ্নিপরীক্ষার কাল। আওয়ামী লীগ সরকার অনুপস্থিত মালিকদের শিল্প-কারখানা অধিগ্রহণ করেছেন, না করেও উপায় ছিল না। কিন্তু এই ব্যবস্থাটাকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করে অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের দরজা খুলে দেয়া হল। সত্য বটে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগের পক্ষে সমাজতন্ত্রের দাবি উপেক্ষা করে একটা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পথ্য গ্রহণ করে নেওয়া একটুখানি ঝুঁকির কাজ হত। তারপরেও লুটপাট দুর্নীতি বন্ধ করে একটি সুস্থ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত না। তিনি ভুল পথ অনুসরণ করলেন। কোন রকমের সহায়ক ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। সমাজতন্ত্র তো প্রতিষ্ঠা করা গেল না। তৈরি করে ফেলেন একটা নৈরাজ্যতন্ত্র। জাতীয় অর্থনীতির

মধ্যে যে ধরনেরই হোক একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা না গেলে অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য আসতে বাধ্য। জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা সৃষ্টি না হলে অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সমাজে কালোবাজারি, মুনাফাখোরি, চোরাচালানি ইত্যাকার যত ধরনের সামাজিক অপরাধ আছে সবগুলো প্রাধান্য বিস্তার করে জাতীয় অর্থনীতির টুঁটি চেপে ধরে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেখা গেল সারা দেশে একটা লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, লাইসেন্স-পারমিট সংগ্রহ করার বেলায় রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তর অপব্যবহার হতে থাকল। সরকারি ছত্রচ্ছায়ায় একদল মানুষ রাতারাতি অঢেল টাকার মালিক হয়ে উঠলেন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তাঁরা কেউ স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা শিল্প-কারখানার মাধ্যমে আয় করেননি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এই অঞ্চলে মাত্র একজন কোটিপতির অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে কোটিপতির সংখ্যা হাজার হাজার। একটি ছোট দরিদ্র দেশে এই পরিমাণ ধনিকের উত্থান, সেটা নির্লজ্জ লুণ্ঠনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কি পরিমাণ লুণ্ঠনের সুযোগ পেলে মাত্র বিশ হাজার টাকার পরিমাণ সম্পদের মালিক এক শ' কোটি টাকার মালিক হতে পারে, বাংলাদেশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজত্বকালে এই কোটিপতিদের জন্ম। জিয়াউর রহমান তাঁদের লালন করেছেন এবং বাড়িয়ে তুলেছেন। এরশাদ সমাজজীবনে তাঁদের আইনগত বৈধতা দিয়েছেন। হাল আমল পর্যন্ত এসে তাঁরা গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটা তাঁদের কব্জার মধ্যে এনে ফেলেছেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া কোন সরকার টিকে থাকতে পারে না। তাঁদের সক্রিয় মদদ ছাড়া কোন দল সরকার গঠন করতে পারে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ছোটখাট দলের সভা কিংবা শোভাযাত্রার জন্যও তাঁদের চাঁদার ওপর নির্ভর করতে হয়।

আমাদের সমাজে এই নব্য নবাবেরা অঢেল টাকার মালিক। ভোগ উপভোগের সমস্ত উপকরণ তাঁদের এখতিয়ারে। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়া তাদের কিছুতেই বলা যাবে না। বুর্জোয়া চরিত্রের মধ্যে অন্য অনেক দোষ যা-ই থাকুক তাদের সেন্স অব বিলঙ্গিং অর্থাৎ এটা আমার নিজের জাতি, এই জাতির উন্নতি অবনতির সঙ্গে সরাসরি আমার ভাগ্যও জড়িত, এই বোধ তাঁদের নেই। আমাদের দেশে যে সকল মানুষ হঠাৎ ধনী হয়ে উঠেছে জাতীয় বুর্জোয়াদের অঙ্গীকার তাঁদের কাছ থেকে আশা করা দুরাশার শামিল। মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলাই তাদের একমাত্র অভীষ্ট। আমাদের জাতীয় মধ্যশ্রেণীটি দুভাবে দেশের মানুষকে শোষণ করে। একদিকে দেশে উৎপাদিত কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি করে দেশের মানুষকে শোষণ করে। অন্যদিকে বিদেশের উৎপন্ন পণ্য দেশে আমদানি করে একইভাবে শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। দেশের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করে জাতিকে স্বনির্ভর এবং বেকার জনগণের কর্মসংস্থানের কোন দায়িত্ব তারা আদৌ বোধ করে না। তাদের বিকাশ আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একটি

সুড়ঙ্গ পথের ভেতর দিয়ে হেঁটে জাতির শিরোভাগে অবস্থান গ্রহণ করে তারা জাতির অগ্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। এই জাতীয় টাকাঅলা মানুষেরা যদি সত্যিকার অর্থে জাতীয় বুর্জোয়ার স্থান দখল করতে পারত, একদিক থেকে দেশের জন্য সেটা মঙ্গলকর হত। বুর্জোয়ারা রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করত এটা ঠিক, কিন্তু সমান্তরালে কৃষক, শ্রমিক এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর রাজনীতি আপনিই বিকশিত হয়ে উঠত। জাতীয় মধ্যশ্রেণীভুক্ত এই সমস্ত মানুষ বাংলাদেশের রাজনীতির মেরুকরণ ঠেকিয়ে রেখেছে। এই কাঠামোহীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের নাটবল্টু ঘোরাবার দায়িত্ব পেয়ে গিয়েছিলেন, দ্রুত ধনী হওয়ার মানসিকতা তাঁদেরও চরিত্রলক্ষণ হয়ে দাঁড়াল। পরোক্ষে তারাও লুণ্ঠনের অর্থনীতির ফায়দা তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সরকারি আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবীসহ সাদা পোশাকের পেশাজীবীদের বেশিরভাগেরই চরিত্র থেকে মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা একেবারেই বিদায় নিল। এই ধরনের একটি লোভ-লাভের সার্বিক পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীরা কখনো ঋজু শিরদাঁড়ার অধিকারী হতে পারেন না। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা যে বেশিরভাগ চরিত্রভ্রষ্ট তার মূল কারণ লুণ্ঠনের অর্থনীতির মধ্যেই নিহিত।

এই দেশে কৃষক শ্রেণীর রাজনীতির একটা গৌরবজনক ঐতিহ্য ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতিরও বেগবান একটা ধারা ছিল। অতীতে ক্ষমতার পালাবদলে তাঁরা বড় বড় ভূমিকা পালন করেছেন। এই দেশের অন্যূন সত্তর শতাংশ মানুষ কৃষক। জনসংখ্যার বিচারে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁদের কোন ভূমিকার কথা দূরে থাকুক, সক্রিয় উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায় না। বেকার রাজনীতি নিলামে কেনা পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষক শ্রমিক নির্যাতিত জনগোষ্ঠী তাদের পছন্দমত প্রতিনিধি সংসদে পাঠানোর কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। যারা চড়া দাম দিয়ে ভোট কিনে নিতে পারে, যারা গুণ্ডা এবং মাস্তান লাগিয়ে পুলিং বুথ দখল করে নিতে পারে, নির্বাচনে তারাই অনিবার্যভাবে জয়লাভ করে। কৃষক এবং নির্যাতিত মানুষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ভোট দিয়ে থাকেন। ভোট দিতে বিরত থাকলেও তাঁদের ভোট আকাশ থেকে ফেরেশতা এসে দিয়ে যায়। দরিদ্র মানুষেরা ভোট দিতে পারেন, কিন্তু নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠাবার অধিকার তাঁদের নেই। আগুনের ছবি আগুনের মত দেখালেও তার দাহিকাশক্তি থাকে না। বাংলাদেশে বর্তমানে যে গণতন্ত্র চালু আছে, সেই জিনিসটি তৃণমূল থেকে উঠে আসেনি। পশ্চিমা শক্তিগুলো দুনিয়াজোড়া গণতন্ত্রের খবরদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তারাই এখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি চালু রেখেছে। কমিউনিজমের পতনের আগে তারা সেনা ছাউনির ওপর নির্ভর করত। হালফিল তাদের গণতন্ত্রের চর্চার ওপর অত্যধিক জোর প্রয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র চালু আছে সেটা যে গণতন্ত্রের প্রহসন, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিম-বাংলার সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। বিগত রাজ্যসভা নির্বাচনে কালু ডোম নামে বর্ধমান জেলার এক প্রার্থী সর্বভারতে পরিচিত এবং

কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। কালু ডোম নামটিতেই তাঁর পেশাগত পরিচয় পাওয়া যায়। এরকম বাংলাদেশে কল্পনা করাও কি সম্ভব? পেশাজীবী মানুষ তাঁদের মনোমত প্রতিনিধিকে সংসদে পাঠাবার কথা কি চিন্তাও করতে পারেন? বাংলাদেশের সংসদে নানা দল থেকে যে সকল সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন, তার শতকরা ষাট ভাগই স্থায়ীভাবে ঢাকা এবং বিশ ভাগ জেলা সদরে বসবাস করেন। তাঁদের শরীরে শ্রমঘামের কোন গন্ধ নেই। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশে যে গণতন্ত্রটি চালু আছে তার মাধ্যমে আসল জনগণের শত্রুরা নির্বাচনে জিতে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর বুকের ওপর সওয়ার হয়ে রক্ত শোষণ করার আইনগত বৈধতাই অর্জন করে।

ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনের লড়াইয়ে জেতার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এলে দলে দলে যে দলটি জিতবে তার পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে। দেখা যাবে আজকে যে আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচনে লড়ছে, গত নির্বাচনে সে একই ব্যক্তি জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। জাতীয়তাবাদী দল থেকে জাতীয় পার্টিতে যাওয়া, জাতীয় পার্টি থেকে আওয়ামী লীগে আসা এগুলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে আদর্শবাদের ক্ষীণতম ছোঁয়াটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। রাজনৈতিক সুবিধাবাদই গোটা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের নিয়ামকশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থটাই সেখানে প্রধান। দেশের জনগণের ভাল-মন্দের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কৃষক-শ্রমিক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় গণতন্ত্রের শেকড় এখানে কত দুর্বল। শুধু ছাত্ররা একটি সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ছাড়াই শুধুমাত্র আমলা এবং এনজিও কর্তারা আরেকটি পতন ঘটাতে পেছপা হবে না।

মুৎসুদ্দি শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি থাকায় গণতন্ত্র এখানে প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করতে পারছে না। সমাজের তৃণমূল অবধি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রসারিত হতে পারছে না। এই মুৎসুদ্দি শ্রেণী অনড় অটল হয়ে সমাজের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রভাব খর্ব করতে না পারলে যে-কোন ধরনের ইতিবাচক রাজনৈতিক উত্তরণের আশা সুদূর পরাহত থেকে যাবে।

পাঁচ

বাঙালি সংস্কৃতি থেকে প্রাণরস আহরণ করে জাতীয়তার বোধটি পুষ্ট এবং বিকশিত হয়েছে। তথাপি বাংলাদেশের সংস্কৃতির আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। কতিপয় মৌলিক সংকট সংস্কৃতি চর্চার পথটিকে কন্টকাকীর্ণ করে রেখেছে। বাংলাদেশের সংখ্যাধিক জনগণের মানস-সংকটেরই প্রতিফলন ঘটছে সংস্কৃতিতে।

বাংলাদেশ নামে যে ভূখণ্ডটিতে আমাদের বসবাস, পঁচিশ বছর আগে সেই দেশটি ধর্মতান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ ছিল। তারও আগে দেশটি পশ্চিম-বাংলার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত ছিল। ব্রিটিশ শাসনের অন্যূন দু' শ' বছরকাল সময় বাংলা প্রদেশ ব্রিটিশ ভারতের একটি স্বতন্ত্র শাসন ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। ব্রিটিশ বিদায়ের প্রাক-মুহূর্তে ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রে বসবাস করতে সম্মত হয়নি বলেই ব্রিটিশ-ভারতকে ভারত এবং পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে হয়েছে। বাংলা প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের একাংশ বাংলার ভাঙন ঠেকাবার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রবল টান অগ্রাহ্য করে বাংলা তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। হিন্দুপ্রধান পশ্চিম-বঙ্গ ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং মুসলিম প্রধান পূর্ব-বঙ্গ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হিসেবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক অস্তিত্বের মধ্যেই অবস্থান তৈরি করেছে। পাকিস্তান ঘোষিতভাবেই ছিল ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পাকিস্তান সৃষ্টির অল্পকালের মধ্যেই পূর্বাঞ্চলের লোকদের বোধোদয় হতে থাকে যে, ধর্মতান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার কিছুই সুনিশ্চিত নয়। উনিশ শ' বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সর্বপ্রথম তাঁদের সংগঠিত প্রতিবাদটি জন্ম নেয়। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি জাতীয়তার বোধটি খারিজ করে বাঙালি জাতীয়তার বোধটি আঁকড়ে ধরে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। এই অগ্রযাত্রার পথটি সরল এবং একরৈখিক নিশ্চয়ই ছিল না। অনেক দ্বিধা এবং দোদুল্যমানতা তাতে ছিল। শেষ পর্যন্ত উনিশ শ' একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয়তার সংগ্রাম এই পর্যায়ে একটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়ার সময় যে সমস্ত বোধ এবং উপলব্ধি সক্রিয় ছিল, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পর দেখা গেল সে সমস্ত বোধ এবং উপলব্ধিগুলোকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি সত্যি সত্যি দুরূহ। বাংলাদেশে ভাষাভিত্তিক যে জাতীয় রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হয়েছে তার সাংস্কৃতিক চেহারার একটি নির্দিষ্ট আকার দান করার প্রশ্নটা যখন উঠল, তখনই প্রকৃত সংকটটা আত্মপ্রকাশ করল। বাংলাদেশে যে নতুন রাষ্ট্রসত্তাটি জন্ম নিয়েছে, তার যে দাবি সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই অঞ্চলের সংখ্যাগুরু অধিবাসী মুসলমান। শুধুমাত্র ধর্মের বন্ধনকে মান্য করে দেড় হাজার মাইল দূরবর্তী একটি অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে এক রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস সম্ভব নয় বলেই নতুন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে এবং রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হিসেবে ধর্মের স্থান থাকতে পারে, সেই প্রত্যয়টা খারিজ করে দিয়েছে। তারপরেও একটা প্রশ্ন মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠী যাদের বেশিরভাগ দরিদ্র এবং নিরক্ষর, তাদের জন্য নতুন সমাজের প্রয়োজনে ধর্মের অভিভাবকত্বহীন একটা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশের সকল ধর্মের এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য

একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নির্মাণ করার চ্যালেঞ্জটা যখন সামনে এল, দেখা গেল বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের তার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা, প্রস্তুতি, মেধা এবং মানসিকতা কোনটাই নেই। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে একটি সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর প্রয়োজন সবচাইতে অধিক ছিল। একটি সর্বব্যাপ্ত জাগরণ, নতুন মানসিকবোধের উদ্বোধন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক একটি উত্থানের ঢেউ লেগে শিল্প, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের কোন শাখা হৃদ্য, সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। পাকিস্তান আমলে যে সকল ব্যক্তি, পাকিস্তান সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ভেতর থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি কখনো ক্ষীণ, কখনো জোরাল সমর্থন ব্যক্ত করার চেষ্টা করতেন, স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা একটা নিরাপদ অবস্থান পেয়ে গেলেন। দেশটির সংস্কৃতির অভিভাবক নতুন ব্রাহ্মণের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় আত্মতুষ্টি এবং তোষামোদের এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করলেন, বাঙালি জনগোষ্ঠীর মুক্তি-সংগ্রাম তরঙ্গ তার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠল না। কৃষক, মজুর, দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিক আত্মত্যাগ করেছে, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন চিহ্নই তাঁদের চিন্তা-চেতনায় স্থান করে নিতে পারেনি। তাঁরাও বাঙালির রাষ্ট্র, বাঙালি জনগণের কথা বলতেন, কিন্তু সেগুলো বিমূর্ত ধারণার অধিক কিছু ছিল না। বাস্তবে যে বাঙালি জনগণ প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম সম্ভাবিত করেছে, সেই হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান জনগণকে এক সূত্রে বেঁধে একটি সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তোলার স্বপ্ন কখনো তাঁদের মনে সঞ্চারিত হয়নি।

যে সাংস্কৃতিক নেতৃশ্রেণীটি বাংলাদেশ আমলে জাতির শিরোভাগে চলে এসেছিল পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেই তাদের বিকাশ এবং সংবৃদ্ধি। তাঁদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা পাকিস্তানি শাসকদের সহযোগিতা করতেন, আবার বাঙালি জনগণের উত্থানের সম্ভাবনা দেখে, নিজেদের বাঙালিত্বের পরিচয়টাও তুলে ধরতে চেষ্টা করতেন। এই শ্রেণীর মানসিক দোলাচল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেরা যখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির অভিভাবক হয়ে বসলেন, দেখা গেল তাঁদের সৃষ্টিশক্তি অবনিত হয়ে গেছে, নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

রাজনীতির ক্ষেত্রে যে জিনিসটি ঘটেছে, দেখা গেল সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে আরম্ভ করেছে। পশ্চিম-বাংলা থেকে যে সকল মুসলমান বুদ্ধিজীবী জিন্নাহ্ সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টির আশায় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন, তাঁদেরই একটা অংশ আচকান শেরোয়ানী পাল্টে গলায় রুদ্দর ঝুলিয়ে তারস্বরে নিজেদের বাঙালি বলে জাহির করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের এই উচ্চারণগুলো ছিল মেকি ভড়ং সর্বস্ব, একটি নতুন জাতির বিকাশ সম্ভাবিত করার জন্য তাদের পালনীয় কোন ভূমিকা ছিল না। জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করার বদলে তাঁরা বিভেদের বীজই বপন করলেন।

উনিশ শ' পঁচাত্তর সালে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর দেখা গেল, একাত্তরের পরাজিত শক্তিসমূহ আবার মাথা তুলতে আরম্ভ করেছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই সমস্ত শক্তিকে পাতাল প্রদেশ থেকে টেনে তুলে আমাদের সমাজ জীবনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন। মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ একে একে ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগল। সমস্ত পরিবেশটা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিষিয়ে তোলা হল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের প্রতাপ অধিকতর বিস্তৃত হয়ে পড়ল। সংস্কৃতির গতিপথটার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য নিত্যনতুন কৌশলের উদ্ভাবন করা হতে থাকল। বাঙালিত্বের বিপরীতে মুসলমান পরিচয়টা খুঁচিয়ে বের করার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত রইল না, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে যে দেশটি জন্ম নিয়েছে তার প্রকৃত পরিচয় মুছে দিয়ে দেশটিকে আবার নতুন পাকিস্তানে পরিণত করার সর্বাত্মক পাঁয়তারা করতে থাকল। সমাজের ওপর হতে তলা পর্যন্ত পশ্চাৎপদ ধারণা রাজ্যপাট বিস্তার করতে আরম্ভ করল।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হত্যা করে যদি একদলীয় শাসন কায়েম করে না বসত স্বৈরাচারী শক্তি সমাজের ওপর জেঁকে বসে মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত অর্জন, সমস্ত প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিশিয়ে দিতে পারত না। যে জনগণ মুক্তিযুদ্ধ করে দেশটিকে স্বাধীন করেছে, সে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগকেও তার বলি হতে হয়েছে।

আওয়ামী লীগের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বুদ্ধিজীবীরা স্বৈরশাসনের পেছনে এমন কোন সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, এমন কোন ভাবাদর্শিক জাগরণ রচনা করতে পারেননি, যাতে করে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের সার্থক প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। সাম্প্রদায়িক শক্তির সহায়তায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসতে হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের সঙ্গে আপোসও তাদের করতে হয়েছে। সরকার সমর্থিত বুদ্ধিজীবীরা সেই একাত্তর সালের পরবর্তী সময়ের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে অসাম্প্রদায়িকতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই সকল প্রত্যয়ের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করছেন। তাঁদের অবস্থানগত স্ববিরোধিতার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেই সকলের দৃষ্টিতে উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়বে। তাঁরা ইনকিলাব পত্রিকায় যে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করছে, তার বিরুদ্ধে জেহাদ করতে প্রস্তুত, কিন্তু স্বৈরাচারী এরশাদ কর্তৃক আরোপিত রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। সেনাবাহিনী কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত গুলিস্তান রমনা কালীবাড়ি পুনঃনির্মাণের ন্যায়সঙ্গত দাবি যখন হিন্দু সম্প্রদায় থেকে উত্থাপিত হয়, তাঁরা অতিরিক্ত দার্শনিক হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ এটাকে এমন একটা দুরূহ দার্শনিক সমস্যা মনে করেন, হঠাৎ করে জবাব দেয়ার কিছু নেই এমন মনে করে থাকেন। (অর্পিত) শত্রুসম্পত্তি আইন বাতিল করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পূর্ণ নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার দাবি যখন ওঠে, এগুলো তাঁদের বিজ্ঞমস্তকে স্থান পাবার উপযুক্ত বিষয় মনে করেন না।

'দোদেল বান্দা কলমা চোর, না পায় শ্মশান, না পায় গোর।' এঁদের অবস্থা অনেকটা সেরকম। এঁরা একটা সরকারকে সমর্থন করছেন, কিন্তু তার পেছনে

নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্যকোন মূল্যবোধ কাজ করছে সে কথা নিজেরাও মনে করেন না। সত্যিকার অসাম্প্রদায়িক হওয়ার বদলে ছদ্মবেশী অসাম্প্রদায়িক সাজার পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে আমাদের হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়েছে। সরকারি দলের বুদ্ধিজীবীরা যে সুবিধাবাদী অবস্থানটিতে দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদের অভিভাবক এবং অসাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিভূ বলে নিজেদের পরিচিত করতে চেষ্টা করছেন, সেই জায়গাটি ভয়ঙ্কর নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি বাহাত্তরের পরবর্তী সময়ের চাইতেও অনেক সংগঠিত এবং পরিকল্পিতভাবে তাঁদের জায়গাটি কেড়ে নিতে ছুটে আসছে। সে শক্তিকে প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা তাঁদের নেই, তাঁদের সততা নেই। তাঁদের বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের কোন বালাই নেই। অতীতে তাঁরা আমাদের জাতিকে ভুল পথে চালিত করেছেন, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সুফলটুকু ভোগ করছেন।

বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক এবং প্রগতিশীল শক্তির সংগ্রাম অধিকতর জটিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আসল সাম্প্রদায়িক এবং নকল প্রগতিশীল সুবিধাবাদীদের যুগপৎভাবে পরাস্ত করতে না পারলে বাংলাদেশের জনগণের সংস্কৃতির উত্থান অসম্ভব। কাজটি সত্যি সত্যিই কঠিন।

ছয়

উনিশ শ' একাত্তর সালে দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার সবগুলো ধর্মভিত্তিক দল নিষিদ্ধ করে এবং তাদের কার্যকলাপ বেআইনি বলে চিহ্নিত করে। তার ফলে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক লীগ, নেজামে ইসলামী, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ এই সকল দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বন্ধ হওয়ার ফলে তাঁরা গোপনে তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে আরম্ভ করেন। যেহেতু প্রকাশ্যে তাঁদের সভা ও সমাবেশ এবং শোভাযাত্রা করার অধিকার ছিল না, তাই তাঁরা ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের কাঁধে ভর করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই পংক্তিটা আছে না, নিন্দাকে রসনা হতে দিলে নির্বাসন, গভীর জটিল মূল অন্তরে প্রসারে— বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সেই জিনিসটি ঘটতে আরম্ভ করল।

তাঁরা মসজিদ এবং মাদ্রাসাসমূহকে তাদের কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করতে থাকলেন। ওয়াজ মাহফিল, ধর্মীয় জলসা, নবীর জন্ম-মৃত্যু তারিখ দশ-পনের দিনব্যাপী সিরাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকলেন। পাকিস্তান যতদিন টিকে ছিল সমাজের ভেতর থেকে এই ধরনের ধর্মীয় জিগীর কখনো উত্থিত হতে দেখা যায়নি। অথচ ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার পর এই সকল প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। সেই সময়ে বাংলাদেশে কোন মানুষের ধনপ্রাণের নিশ্চয়তা নেই। একদিকে চলছে রাজনৈতিক নিষ্পেষণ অপরদিকে

সরকারি সন্ত্রাসের মোকাবেলা করার জন্য চরমপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো পাল্টা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আয়োজন করে যাচ্ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ, অনাহারে মানুষ মারা যাচ্ছে। এই ধরনের একটা সংকটজনক সময়সন্ধিতে দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকার কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারছে না। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সরকার ইচ্ছা করলেও হয়ত অধিক কিছু করতে পারতেন না। নানাধরনের সমস্যার ভারে তাঁদের হিমশিম খেতে হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল দেশের সাধারণ মানুষ সরকারের স্বচ্ছতার ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার কারণও ছিল। সরকারি পৃষ্ঠাপোষকতায় একদল মানুষ রাতারাতি ধনী হয়ে উঠল। তারা দোকান, বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ সকল দখল করতে থাকল।

এই ধরনের কুয়াশাচ্ছন্ন একটা পরিবেশে পাকিস্তানের সমর্থকগোষ্ঠী মুসলিম বাংলা গঠন করার জন্য তৎপরতা চালিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন। এখানে সেখানে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান হতে থাকল। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী সরকারি নীতি এবং আদর্শের সমর্থক ছিলেন সমাজের তৃণমূল থেকে উত্থিত সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ করার কোন বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। দেশের বিবেকবান মানুষের কাছে তাঁদের কোন গ্রহণযোগ্যতা অবশিষ্ট ছিল না। মুসলিম বাংলার সমর্থকরা মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ধর্মীয় সভাগুলোতে ফিসফিস করে বলতে আরম্ভ করলেন, ভারত পাকিস্তানকে হটিয়ে গোটা বাংলাদেশটা দখল করে বসেছে। এই দেশে মুসলমানদের ধন, প্রাণ, ঈমান কিছুই নিরাপদ নয়। শত ধারায় এই ধরনের নেপথ্যে প্রচারের কারণে সমাজের ভেতর থেকে ঘূর্ণিহাওয়ার মত সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগ্রত হয়ে জনমানসে জীবাণুর মত প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল।

দক্ষিণপন্থী ধর্মভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে, অনেকগুলোই সাইনবোর্ডসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য যে দলটি দায়ী সেই পাকিস্তান মুসলিম লীগ উনিশ শ' চুয়ান্নের নির্বাচনে সেই যে ধরাশায়ী হয় আর কখনো কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি। জেনারেল আইয়ুব মুসলিম লীগের একটি অংশকে নতুন জীবন দান করতে চেষ্টা করেছিলেন। আইয়ুবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ শুধুমাত্র একটা নিষ্প্রাণ অস্তিত্বে পরিণত হয়। এই দলগুলোর মধ্যে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই ছিল ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন। পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্য জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরাই সবচাইতে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা সর্বতোপায়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করেছেন। রাজাকার, আলবদর, আলসামস্ ইত্যাদি যে সকল সন্ত্রাস সহায়ক বাহিনী যুদ্ধকালে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার সিংহভাগই এসেছে জামায়াতে ইসলামী দলটি থেকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর জামায়াতে ইসলামীর অধিকাংশ কর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু অল্পসংখ্যক অপরাধীই ধরা পড়ে। এই অপরাধীদের অনেকেই নগদ অর্থের বিনিময়ে সরকারের লোকদের কাছ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। বেশ কিছু অংশ নানা কৌশল অবলম্বন করে সৌদি আরব, কুয়েত, ইরান

ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশে চলে যায়। এক পর্যায়ে পূর্ব-পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজমও পাকিস্তান থেকে সৌদি আরবে চলে আসেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে, বিশেষ করে সৌদি আরব এবং কুয়েতে এই সকল পলাতক জামায়াত সদস্য নিজেদের সংগঠিত করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে জোরাল প্রচার চালাতে আরম্ভ করেন। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য লন্ডন অফিসটি ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যের সকল শ্রেণীর মানুষদের বোঝাতে থাকেন যে বাংলাদেশে ইসলাম সত্যি সত্যি বিপন্ন। ভারতের হিন্দুরা বাংলাদেশ দখল করে ফেলেছে। বাংলাদেশে অনেকগুণ বেশি ইসলামকে জীবিত রাখতে হলে সেখানে গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র মসজিদ এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কেননা মসজিদ এবং মাদ্রাসাই ইসলামকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র গ্যারান্টি।

মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ তাঁদের কথা বিশ্বাস করেছেন। মসজিদ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা অর্থে বাংলাদেশের শহর বন্দর থেকে শুরু করে একেবারে নির্জন গ্রামে পর্যন্ত অনেক মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয়েছে। একটা পরিসংখ্যান নিলে জানা যাবে পাকিস্তানে বিগত পঁচিশ বছরে যত পরিমাণে মসজিদ মাদ্রাসা তৈরি হয়নি, বাংলাদেশ আমলে পঁচিশ বছর সময়ের মধ্যে তার চাইতে অনেকগুণ বেশি মসজিদ মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে এমন কোন গ্রাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে, যেখানে একটি মাদ্রাসা নেই। বর্তমানে মাদ্রাসা গ্রাম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে কোন প্রার্থীকে বিজয়ী হতে হলেও মাদ্রাসার সমর্থন লাভ জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের শহরগুলোতে তাঁরা পরিকল্পনা করে এমন কতিপয় মসজিদ নির্মাণ করেছেন যার সঙ্গে এক একটি সুপার মার্কেট সংযুক্ত রয়েছে। এইসব মার্কেট থেকে ভাড়া ইত্যাদি বাবদে যে অর্থ আদায় হয় তার এক ভগ্নাংশ মাত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যয় করা হয়। বাকি বিপুল পরিমাণ অর্থ ধর্মীয় রাজনীতির পেছনে ব্যয়িত হয়। মসজিদ ছাড়া তাঁরা ক্লিনিক, হাসপাতাল, ব্যাংক এবং আরো নানারকম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান করে, দেশের ভেতর থেকেই একটা আয়ের উৎস সৃষ্টি করে ফেলেছেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একটা শক্ত আর্থিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই মাসে মাসে মাসোহারা দিয়ে বিপুল সংখ্যক কর্মী এবং প্রচারক পোষা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। রাজনৈতিকভাবে সমাজে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলেও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তারা শক্তি সংগ্রহ করে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করে ফেলেছেন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুজিব সরকারের আমলে শিক্ষা সংস্কারের কথা উঠলেও জনমত বিপক্ষে যায় এই আশঙ্কায় তিনি মাদ্রাসা শিক্ষায় হাত দিতে সাহসী হয়ে উঠতে পারেননি। জিয়ার আমলে এই মাদ্রাসাসমূহকে সরকারের সমর্থন ক্ষেত্রে পরিণত করার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরশাদ আমলে মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে ধর্মীয় রাজনীতি ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে

মাদ্রাসাসমূহ যে পরিমাণ সরকারি অনুদান পেয়েছে, তা মাধ্যমিক স্কুলগুলোর জন্য বরাদ্দ অর্থের চাইতে বেশি।

এই সমস্ত কারণ ছাড়াও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা গাঢ়মূল হওয়ার একাধিক আন্তর্জাতিক কারণ বর্তমান। আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, ইরান, মিশর এই সকল মুসলিম দেশে মৌলবাদের উত্থান বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশ মুসলমান প্রধান দেশ হওয়ায় মুসলিম জগতের চলমান ঘটনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। কিছু না কিছু প্রভাব আবশ্যই পড়ে। আরো একটি বিষয় অবশ্যই স্পষ্ট করা প্রয়োজন। সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙন, কম্যুনিজমের ভরাডুবি এবং সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় একগুচ্ছ মুসলিম রাষ্ট্রের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো পৃথিবীতে তাদের প্রভুত্বমূলক আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করেছে। পশ্চিমা তাত্ত্বিকেরা বলেছেন, আগামীতে পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে যদি অন্যকোন শক্তির সংঘাত বাঁধে তাহলে প্রথম সংঘাতটি বাঁধবে ইসলামের সঙ্গে এবং দ্বিতীয় সংঘাতটি হতে পারে কনফুসীয়পন্থী চীনের সঙ্গে। পশ্চিমা শক্তিগুলো ইসলাম ধর্মের প্রতিরোধ ক্ষমতা খর্ব করার জন্য দুনিয়াজোড়া নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মুসলিম দেশগুলোতে এক ধরনের ধর্মীয় পুনরুত্থান জেগে উঠছে, বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। এই সামাজিক রূপান্তরটা এত চুপিসারে ও নীরবে ঘটছে যে, কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে তার প্রভাব অস্বীকার করা অসম্ভব নয়। ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকেও উনিশ শ' ছিয়ানব্বই সালে এই সাম্প্রদায়িক প্রভাবের কিছু কিছু স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমতায় আসতে হয়েছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সশস্ত্র হামলার মুখে ঘরবাড়ি দেশ ফেলে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ভারতে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নয় মাস পর দেশে ফিরে দেখেন তাঁদের ঘরবাড়ি অবশিষ্ট নেই। তাঁদের দোকান-পাট, জমি-জমা, পুকুর এমনকি ভিটে-মাটি পর্যন্ত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দখলে চলে গেছে। এই দখলদার সংখ্যাগুরুদের মধ্যে সকলে পাকিস্তান ভক্ত নয়, সরকার সমর্থক দেশপ্রেমিক জনগণেরও অভাব নেই। বেশিরভাগ হিন্দু তাঁদের ঘরবাড়ি এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি যা কিছু হাতের কাছে ছিল সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই নয় মাসে তার সবটাই নিঃশেষ করে ফেলতে হয়েছে। সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় ঘর-বাড়ি আবার নতুন করে গড়ে তোলার কাজে মন দিলেন। তাঁদের হাতে কোন সহায় সম্পদ নেই। সরকার তাঁদের পুনর্বাসনের কাজে কোনরকম সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করলেন না। সংখ্যাগুরু প্রতিবেশীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহানুভূতি পর্যন্ত তাঁরা পেলেন না। তথাপি তাঁদের মনে একটা সান্ত্বনা ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা সহ্য করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁরা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নন। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিষয়ের সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুদের মত তাঁদের সমান অধিকার। ঘর-বাড়ি তৈরি করে

থিতু হয়ে বসার পরে তাঁরা যখন অধিকারবোধটা ব্যবহার করতে চাইলেন, তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি এই স্বাধীন বাংলাদেশেও তাঁদের জন্য মর্মান্তিক আঘাতটা অপেক্ষা করছিল। স্বাধীনতার এক বছর না যেতেই পাকিস্তান আমলের চাইতেও জোরাল সাম্প্রদায়িকতার মুখোমুখি তাঁদের দাঁড়াতে হল। স্বাধীনতার পর প্রথম দুর্গোৎ-সবটাতেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং বরিশালের নানা জায়গায় দুর্গাপ্রতিমা ভেঙে ফেলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণে বাধা দেয়া হল। ভারত বিরোধিতা এবং হিন্দু বিরোধিতা এক হয়ে গেল। বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দূরত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা এক রকম প্রায় দুঃসাধ্য করে তুলেছে, তার জন্য আরো কতিপয় বিষয় পর্যালোচনার প্রয়োজন।

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় আইয়ুব খান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়িসহ পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে এক অর্ডিন্যান্স বলে শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছিলেন। হিন্দুসম্প্রদায় পাকিস্তান আমল থেকেই এই নাগরিক অধিকারবিরোধী আইনের প্রতিবাদ করে আসছিল, কিন্তু ফলোদয় হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁরা আশা করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে এই আইনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এই আইনের নামটা পরিবর্তন করে শত্রু সম্পত্তির স্থলে অর্পিত সম্পত্তি রাখলেন, কিন্তু কার্যকারিতা একই রকম থেকে গেল। শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি ছিলেন তাঁদের একরকম ভরসাস্থল, তাঁর এই ধরনের সংবেদনহীনতা হিন্দুদের চূড়ান্তভাবে হতাশ করল। উনিশ শ' একাত্তর সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী রমনার বহু পুরনো কালীবাড়ি ধ্বংস করে। ওই একাত্তর সালেই সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আন্তর্জাতিক চাপে বাধ্য হয়ে রমনা কালীবাড়ি পুনঃনির্মাণের টেন্ডার আহবান করেছিলেন এরকম শোনা যায়। যা-হোক বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে হিন্দুসম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে রমনার কালীমন্দির পুনঃনির্মাণ করার অনুমতি পাননি। শেখ মুজিবুর বোধ করি তাঁদের বলেছিলেন, ওই নাজুক সময়ে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দিলে তাঁর সরকারের বিপদ হতে পারে। এইভাবে খোদ মুজিব শাসনামলেই তাঁদের একটার পর একটা আশাভঙ্গ ঘটতে থাকে।

উনিশ শ' পঁচাত্তর সালে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর পুরো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিই পাল্টে গেল। পাকিস্তানপন্থী শক্তির ক্ষমতা দখল করার পর হিন্দুরা অধিকতর অসহায় এবং জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্নবোধ করতে থাকেন। তারপরে জিয়াউর রহমানের আমলে এসে সংবিধানের যখন পরিবর্তন করা হল, হিন্দুসমাজের হতাশা ঘনীভূত আকার ধারণ করল। তাঁদের মনোভাব দাঁড়াল এ রকম, বাপ-পিতামহের এই দেশটিতে আমাদের কোন অধিকার নেই। এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের চূড়ান্ত রকম আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। তথাপি আমাদের সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি আমাদের বসবাস করতে হয়। আমাদের পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ধান, বাগানের তরিতরকারি ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে যখন জোর করে

কেটে নিয়ে যায়, আমরা কোন প্রতিবাদ করতে পারিনে। আমরা বিচার পাইনে, পুলিশ আমাদের কথা শুনে না, আইন আদালত করতে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। আমরা স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত এবং নিরাপদ বোধ করতে পারিনে। আমাদেরকে চাকরি-বাকরি দেয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করা হয়। আমরা কারবার তেজারত করে জীবন ধারণ করব, সেরকমও ভরসা পাইনে। এই দেশটিতে থেকে আমাদের কী লাভ হবে। দলে দলে হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে আরম্ভ করলেন।

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রবল হয়ে উঠছিল, তার প্রভাব যে হিন্দুদের ওপর পড়েনি সে কথাও বলা যাবে না। চিত্তরঞ্জন সুতারের নেতৃত্বে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন নামে একটি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সুতরাং বাবুর দাবি ছিল বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী তিনটি জেলা হিন্দু জনসাধারণের বসবাসের জন্য আলাদা করে দেয়া হোক। হিন্দু মৌলবাদী শক্তি চিত্তরঞ্জন সুতারকে দিয়ে এ আন্দোলনটি সৃষ্টি করিয়েছিল। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও বাংলাদেশ সরকারকে বিব্রত করার জন্য বঙ্গভূমি আন্দোলনকে উস্কে দিয়েছে। এরশাদ ক্ষমতায় এসে সংসদে আইন পাশ করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দেশত্যাগের মাত্রা অধিক হারে বেড়ে গেল। নানা রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান বটে, কিন্তু আইনটি রদ করা সম্ভব হল না। উনিশ শ' ছিয়ানব্বই সালে হিন্দুসম্প্রদায়ের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ক্ষমতা লাভের পরও দেখা যাচ্ছে আইনটি যথাযোগ্য বহাল রয়েছে।

উনিশ শ' একানব্বই সালে ভারতে বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দু মৌলবাদীরা মোগল সম্রাট বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ষোড়শ শতাব্দীর মসজিদ ভেঙে ফেলে, ওই জায়গায় শ্রীরামচন্দ্রের নামে একটি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। তার প্রতিবাদে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্র হিন্দুসম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরা হামলা শুরু করেন। হিন্দুদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগানো হয়, তাঁদের দোকান-পাট ভেঙে ফেলা হয়, তাঁদের মন্দির ও দেবালয় শ'য়ে শ'য়ে ধ্বংস করা হয়। খালেদা জিয়ার সরকার দাঙ্গা প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। অপর প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ব্যাপক মুসলমানের কাছে অপ্রিয় হওয়ার ভয়ে হিন্দুদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারলেন না। হিন্দুসম্প্রদায়ের মানুষেরা দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকে অনেকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়েছেন। উনিশ শ' একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতাও তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু উনিশ শ' একানব্বই সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসজনিত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অন্য কোন নিষ্ঠুরতার তুলনা চলে না। তাঁরা চূড়ান্ত অসহায়তা সহকারে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হলেন, কী প্রচণ্ড আক্রোশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের আক্রোশ, সময় বিশেষে তা সাইক্লোন, সমুদ্র-প্লাবন কিংবা বিধ্বংসী ভূমিকম্পের চাইতেও মারাত্মক হতে পারে।

এই সমস্ত ঘটনার অভিঘাত হিন্দু সম্প্রদায়ের সংবেদনাকে এতটা আহত করেছে, তাঁরা বাংলাদেশে নির্ভর করার মত কোন অবলম্বনই খুঁজে পেলেন না। কোন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সমর্থক বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের মত মানুষকে ভোরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করতে হয়, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতি অবিশ্বাস, সংশয় এবং আতঙ্কের কারণে বাংলাদেশের হিন্দুরা অপর দুটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধদের নিয়ে 'হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের পেছনের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, বাস্তবে তার কর্মকাণ্ড সাম্প্রদায়িক খাতেই প্রবাহিত হচ্ছে একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। তারপরেও এই ধরনের সংগঠনের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। মুসলমানেরা যদি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে পারে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অত্যাচারের শিকার হওয়ার চাইতে সাম্প্রদায়িকভাবে সংগঠিত প্রতিবাদ রচনা করা অনেক পুরুষোচিত কাজ।

তারপরেও একটা কথা থেকে যায়। সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, এই দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন পরিণতির দিকে ধাবিত হবে, সেই জিনিসটি কল্পনা করলেও আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। বাংলাদেশের হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার একটা বিষাক্ত স্রোত সাপের মত এঁকে-বেঁকে প্রবাহিত হয়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। এই প্রক্রিয়াটি ক্রমশ বলবান হয়ে উঠেছে। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের অবস্থানটি যদি নেপালের মত হত আমাদের দুশ্চিন্তা করার বিশেষ কারণ থাকত না। নেপাল পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে নেপালের জনগণই সবচাইতে ভারতবিরোধী তা এক জরিপে প্রমাণিত হয়েছে। সুদীর্ঘকালের ঐতিহাসিক সংলগ্নতার কারণে ভারত-বাংলাদেশ, হিন্দু-মুসলমান এই সম্পর্কের ধরনগুলো সরল এবং একমাত্রিক নয়। সেই কারণে ভারত বিরোধিতা এবং হিন্দু বিরোধিতা এক হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনায়াসে হিন্দু বিরোধিতাও ভারত বিরোধিতায় রূপান্তরিত হতে পারে। মুসলিম দেশগুলোতে উত্থিত মৌলবাদের প্রভাব যেমন মুসলিম জনগোষ্ঠীর একাংশকে প্রভাবিত করছে, তেমনি ভারতবর্ষের সঙ্ঘ পরিবারভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর অনুসৃত মৌলবাদ হিন্দু সমাজের একাংশকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। মুসলিম মৌলবাদের পাশাপাশি হিন্দু মৌলবাদও সমাজের গভীরে শেকড় বিস্তার করছে। হিন্দুরা যেহেতু সংখ্যালঘু এবং সামাজিকভাবে নির্যাতিত, মৌলবাদের প্রতি তাঁদের ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে বিষয়টার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দেখা গেল, এক সুপ্রভাতে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মূর্তি তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন জগন্নাথ হল কর্তৃপক্ষ। স্বামী বিবেকানন্দের অন্য অনেক পরিচয় যাই থাকুক, তাঁর ধর্মীয় পরিচয়টাই তাঁর অন্যবিধ পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা কবা হয় না। কিন্তু

এখানে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হল, তখনই মুসলিম শিক্ষকদের কেউ কেউ অগ্রণী হয়ে প্রস্তাব তুললেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে এবং ফজলুল হক মুসলিম হলে নতুন করে নামকরণ করা হোক। আরেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম পাল্টানোর প্রস্তাব করলেন। প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটিও অপ্রিয় বাক্য বিনিময় ছাড়া একটি সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় থেকে কতদূরে সরে যাচ্ছে, এই সকল ঘটনার মধ্যে তার প্রমাণ মেলে।

পাকিস্তান আমলে জগন্নাথ হল ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর ছাত্রাবাস। এই হলটি প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হত। সাম্প্রতিককালে পূজা-পার্বণ ধর্মীয় উৎসব এই হলে এত অধিক পরিমাণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আতঙ্ক কত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তরুণদের অন্যবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ অসম্ভব হয়ে উঠেছে বলেই, তারা অধিক হারে ধর্ম-কর্মের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, একটা কথা অবশ্য উঠতে পারে, ভারতের বিজেপির প্রভাবের কারণেই এসব ঘটছে। বাংলাদেশের মুসলমান ছাত্ররা যদি মদ্রাসায় আফগানিস্তানের তালেবানদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য গোপনে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে হিন্দু ছাত্রদের অনুরূপ কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার অধিকার কেন থাকবে না। যুক্তির পিঠে যুক্তি দিয়ে, কথার খেলা অনেক করা যায়। কিন্তু তাতে আসল সংকটের কোন হেরফের হবে না।

একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা প্রয়োজন। হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পলিটিক্যাল ডিমোরালাইজেশনের প্রক্রিয়া অনেকদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে। সেটা এখন এমন একটা আকার ধারণ করেছে, সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু কারো পক্ষে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই। পলিটিক্যাল ডিমোরালাইজেশন গ্যাংগ্রিনের মত, সমাজ-দেহের যে কোন অংশে এর বিষক্রিয়া শুরু হলে অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। সংখ্যালঘুকে আশ্রিত ভেবে করুণা করা, কিংবা ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা উভয়ই ন্যায়ত স্বাধীন মানুষের নাগরিক সত্তার বিরুদ্ধে অপরাধ। ভারত উপমহাদেশের বিভক্তি, পাকিস্তানের জন্ম, পাকিস্তানের ভাঙন আমাদের ইতিহাসের এই সকল ঘটনা একযোগে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে এই পলিটিক্যাল ডিমোরালাইজেশনের জন্ম দিয়েছে। অনুকূল পরিস্থিতিতে সেই ক্ষত শুকিয়ে আসতে থাকে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাতে পুঁজ-রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ যে মূলচিন্তার উপর দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছে সেই বোধ যদি পূর্ণ দৈর্ঘ্যে বিকশিত হতে পারত, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ফারাক অবশ্যই কমে আসত। যে সমস্ত সরকার বাংলাদেশ শাসন করেছে বা এখনো করছে, তারা সোচ্চার মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক হোক বা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কৌশলগত আনুগত্য প্রদর্শন করুক, কমবেশি সকলে এই অপরাধে অপরাধী। তারা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত মর্মবাণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নির্যাতিত মানুষ যেখানে জন্মগত

অধিকার ভোগ করতে পারে না, যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমাজে অবস্থানগতভাবেই নির্যাতিত, তাই অন্য সকল নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের সংগ্রাম জড়িত না করলে সম্প্রদায়গতভাবে তাদের মুক্তি অর্জন অসম্ভব। একমাত্র নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীর সম্মিলিত সংগ্রামই সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ফারাকরেখা মুছে দিতে পারে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির বয়স পঁচিশ বছর। কিন্তু বাংলাদেশি সমাজের বয়স হাজার হাজার বছর। সামাজিক সংকটগুলো সামাজিকভাবেই আমাদের সমাধান করতে হবে। সমাজের সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর বিবেকবান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের একটা সত্য অনুধাবন করার সময় এসেছে, আমাদের সকলকে দেশে পাশাপাশি বসবাস করতে হবে। ভালবাসা দিয়ে এবং ভালবাসা পেয়ে বেঁচে থাকার একটা মিলিত কৌশল আমাদেরই উদ্ভাবন করতে হবে। অবশ্যই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দায়দায়িত্ব এতে অনেক বেশি।

সাত

বাংলাদেশি রাজনীতি সংস্কৃতির যা কিছু উজ্জ্বল অংশ তার সিংহভাগই বামপন্থী রাজনীতির অবদান। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে বামপন্থী রাজনীতির উত্তাপ থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির নবজন্ম ঘটেছে। সামন্ত সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত একটি নতুনতর সংস্কৃতির উন্মেষ বিকাশ লালনে বামপন্থী সংস্কৃতিসেবীদের যে বিরাট সাফল্য এবং ত্যাগ; তিল তিল করে সংস্কৃতির আসল চেহারাটি ফুটিয়ে তোলার কাজে বামপন্থী সংস্কৃতিকর্মীরা যে শ্রম, মেধা এবং যত্ন ব্যয় করেছেন, সে কাহিনী এখন প্রায় বিস্মৃতিতে বিলীন হতে চলেছে। তাঁদের সাফল্যের পরিমাণ হয়ত আশানুরূপ ছিল না কিন্তু সূচনাটি করেছিলেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত সংস্কৃতিকে লালন করেছেন। সংস্কৃতিতে উত্তাপ, লাবণ্য এবং গতি সঞ্চার করার ব্যাপারে বামপন্থী সংস্কৃতিকর্মীরা অনেক কিছু দিয়েছেন। সেইসব মহান অবদানের কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করার প্রয়োজন এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

বামপন্থী রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকেই বাংলাদেশের জাতীয়তার বোধটি প্রথম অঙ্কুরিত এবং মুকুলিত হয়। বাঙালি জাতীয়তার প্রাথমিক সোপানগুলো বামপন্থী রাজনীতির নেতা-কর্মীরাই নির্মাণ করেছিলেন। সেজন্য তাঁদের জেল, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন কম সহ্য করতে হয়নি। সেই সময়ে আওয়ামী লীগ দলটির কাছ থেকেও তাঁদের কম নিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি। পাকিস্তানের সংহতি বিনাশকারী, বিদেশি গুপ্তচর, ইসলামের শত্রু এই ধরনের অভিযোগ বামপন্থী রাজনীতির নেতা এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে হামেশাই উচ্চারিত হত। এসব লাঞ্ছনা সহ্য করেও বামপন্থী রাজনীতির নেতা এবং কর্মীরা ধর্মতান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতরেই একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের ভ্রূণ রোপণ করতে পেরেছিলেন। বর্তমানের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা যেটুকু সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক অধিকার ভোগ

করেন, তার পেছনে রয়েছে বামপন্থী রাজনীতির বিপুল পরিমাণ অবদান। বামপন্থী রাজনীতিই শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্ত সমস্ত নির্যাতিত মানুষকে অধিকার আদায়ের স্বপ্ন দেখিয়েছে, সংগঠিত করেছে এবং আন্দোলনে টেনে নিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য বামপন্থী আন্দোলন এখন রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ উত্থানরহিত।

বামপন্থী রাজনীতির মুমূর্ষু অবস্থা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যকে তমসাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই দেশটির সত্তর ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অথচ এই দেশটির রাজনৈতিক ক্ষমতা যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তার মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক নিম্নবিত্ত মানুষ গুটিকয় মানুষের শোষণ-পীড়নের শিকারে পরিণত হয়ে আসছে। তাঁরা এমন কোন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি, যার সাহায্যে তাঁরা নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলার সুযোগ পান।

মধ্যশ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে শোষণের মাধ্যমেই নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রেখেছে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাঁরা দেশে শিল্প-কারখানা তৈরি করে দেশের বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারেন না। অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতেও তাঁরা অক্ষম। বাংলার ঘুণেধরা গ্রাম সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন করে নতুন সমাজ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা তাঁদের নেই। সংখ্যাধিক জনগোষ্ঠীর প্রাণপ্রিয় দাবি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষাব্যবস্থা— এসবের ব্যবস্থা তাঁরা করেন না। আমাদের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ সৃজনী ক্ষমতা রয়েছে, সেটাকে মুক্তি দিয়ে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণও তাঁদের অভীষ্ট হতে পারে না। তাঁরা নিজেদের শাসন-শোষণের মাধ্যমে জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে গোটা সমাজটাকে এমন একটা কারাগার বানিয়ে রাখতে চান, যাতে করে মানুষ তাঁর অধিকার কখনো ভোগ করতে না পারে। শাসকশ্রেণী সমাজের ওপর তাঁদের অপ্রতিহত শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাঁবেদারি করে এবং আগ্রাসী শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতেও কুণ্ঠিত হন না। এই সমাজে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি সমাজের স্বার্থরক্ষা করতে পারে এমন বলিষ্ঠ আন্দোলন সমাজের অভ্যন্তর থেকে জেগে উঠতে পারছে না। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব খুবই সামান্য। বামপন্থী রাজনীতির মধ্যে কোন ঐক্য নেই। তারা অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উপদলে বিভক্ত। দেশের প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণের বদলে অপ্রয়োজনীয় মতাদর্শগত বিতর্কে তাঁদের সময় কাটে। বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলোর পক্ষে সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। কোনরকমে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারলেও সে সকল প্রার্থী নির্বাচনে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, তাঁদের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়। তাদেরকেও মধ্যশ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মত ধনিকদের চাঁদার ওপর নির্ভর করতে হয়। এক কথায়, বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতি সর্বপ্রকার উত্থানশক্তি হারিয়ে বসেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বামপন্থীদের কোন অবস্থান না থাকার কারণে বেবাক

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দক্ষিণপন্থী কক্ষপথে ঢুকে পড়েছে। এই দুষ্টচক্রের ভেতর থেকে টেনে বের করতে না পারার কারণে গোটা রাজনীতিটাই পচে উঠেছে।

বামপন্থী রাজনীতির এই দৈন্যদশা সমস্ত দেশপ্রেমিক এবং মুক্তিকামী মানুষের দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন একটা সময় ছিল, যখন বামপন্থী রাজনীতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সকলের সামনে পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। সকলে বামপন্থী রাজনীতির ভবিষ্যতের মধ্যেই দেশের ভবিষ্যৎ দেখতেন। এখন তাঁদের অতীতদিনের স্মৃতির কথা স্মরণ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাংলাদেশের শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জের হাজার হাজার কর্মী যাঁরা দেশ এবং জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য সব রকমের আত্মত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হননি; এই সমস্ত ত্যাগী এবং নিষ্কলঙ্ক কর্মীরা এখন সকলের করুণার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। রাজনীতি, কালোবাজারি, লুটেরা চোরাচালানি— এককথায় সমাজের যত খারাপ মানুষ আছে, তাঁদের স্থায়ী পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে। রাজনীতিতে সৎ মানুষের অবস্থান বহুকাল পূর্বেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, চিহ্নিত অপরাধী, মাফিয়াচক্রের হাতে দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য বন্দী হয়ে আছে। এই অবস্থাটি যদি দীর্ঘদিন এভাবে চলতে থাকে, এই সমাজ মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়বে।

এই পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর জন্য দেশের কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের একটি রাজনৈতিক উত্থান অবশ্যম্ভাবী। পরিতাপের বিষয় হল কৃষক, শ্রমিক, বিত্তহীন এবং নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের সঙ্কট পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। অথচ তাদের প্রতিবাদ করার কোন উপায় নেই। তাঁদের দাবির কাছে শোষকশ্রেণীগুলোকে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে পারে, এমন কোন সংগঠন নেই। ইতিহাস ঘাঁটলে এমন বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণ অতীতে এরকম উত্থানশক্তিহীন ছিল না। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র এবং নিম্নবিত্ত মানুষের সম্মিলিত আন্দোলনের তোড়ে ভূতপূর্ব পাকিস্তানের জঙ্গী লাট আইয়ুব খানকে পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। অথচ বর্তমান সময়ে দরিদ্র মানুষের একজন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পর্যন্ত নির্বাচিত করার ক্ষমতা নেই।

বামপন্থী রাজনীতির বর্তমান স্থবিরতার কারণগুলো অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের পেছনের দিকে না তাকিয়ে গত্যন্তর নেই। বামপন্থী রাজনীতির মধ্যে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা মূর্তিমান হয়ে উঠেছিল, তা অনেকের মধ্যেই আশাবাদ জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। সকলে আশা করেছিলেন বামপন্থী রাজনীতিই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। বামপন্থী রাজনীতির প্রবল প্রবাহে স্তরের পর স্তর বালু সঞ্চিত হয়ে মূল স্রোতধারাটিই রুদ্ধ করে ফেলেছে। বিভ্রান্তি বিচ্যুতির সে বালুরাশি খনন করে বামপন্থী রাজনীতির গতিমুখটি উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য অতীতের বিচ্যুতি এবং বিভ্রান্তিগুলোর দিকে অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকানো অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে।

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের পূর্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কৃষক সমিতি যখন অবিভক্ত ছিল, সে সময়টাই ছিল

বামপন্থী রাজনীতির স্বর্ণযুগ। সমাজের ভেতর থেকে সেই সময়ে যে শক্তিপুঞ্জ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল সকলে আশা করতেন, হয়ত সেদিনের বেশি দেরি নেই, যখন এই সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে এই দেশের জনগণের কল্যাণমুখী একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন মতাদর্শগত কারণে দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাচ্চা নেতা কে— চীন না সোভিয়েত ইউনিয়ন, তা নিয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়। একদিকে চীন, অন্যদিকে রাশিয়া। তার প্রভাব আমাদের দেশেও পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক সমিতি, শ্রমিক ইউনিয়ন এই সকল সংগঠন চীন-রাশিয়ার প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই চীন-সোভিয়েত বিরোধের কারণে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বামপন্থী আন্দোলনের ওপর প্রথম আঘাতটা আসে।

তারপরে ভারত আর চীনের মধ্যে যখন সীমান্ত যুদ্ধ সংগঠিত হয়, আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলনে আর একটা বিভক্তি নেমে আসে। বেশিরভাগ হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত নেতা এবং কর্মী সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সমর্থন দিতে থাকেন। অন্যদিকে মুসলিম সমাজ থেকে আগত বেশিরভাগ নেতা এবং কর্মী চীনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এই সময়ের হিন্দু কমিউনিস্ট এবং মুসলমান কমিউনিস্ট শব্দ দুটি সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যায়। বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে এই যে বিভক্তি ঘটল, তার পেছনে আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির চাইতে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রভাবই সর্বাধিক সক্রিয় ছিল।

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যখন ছয়দফা কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে আসেন, মস্কো সমর্থক রাজনীতির অনুসারীরা পারস্পরিক বিবাদে রত ছিলেন। কিন্তু দুটি দলই ছয়দফা কর্মসূচির নিন্দা করতে ছাড়লেন না। সে সময়ে রাশিয়া, ভারত এবং পাকিস্তান মিলিয়ে চীন বিরোধী একটা ব্লক করার প্রস্তাব দিয়েছিল। মুখ্যত সে কারণে মস্কোপন্থী সংগঠনগুলো নিখিল পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব রক্ষার প্রতি অধিক যত্নবান হলেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে 'হোয়াট ইজ অটোনমি' পুস্তিকাটি লিখে প্রকারান্তরে তৎকালীন পূর্ব-বাংলার জাতি সত্তার প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন। উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থটা বড় করে দেখার কারণে তাঁর লেখা পুস্তিকাটি অধ্যাপক সাহেব বেমালুম ভুলে যেতে পেরেছিলেন।

সেই সময়ে মওলানা ভাসানীর ছত্রচ্ছায়ায় বেইজিংপন্থী রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছিল। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে চীন পাকিস্তানের অবস্থানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল বলে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনপন্থী রাজনীতির অনুসারীরা আদর্শগত কারণে চীনের প্রতি অনুগত ছিলেন। চীনের নেতৃবৃন্দ তাঁদের অনুসারীদের বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরোধিতা করলে পাকিস্তানের

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হবে। সুতরাং চীনপন্থীদের মধ্যে আইয়ুবের বিরোধিতা না করার একটা মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বরঞ্চ তাঁরা শেখ মুজিবের ছয়দফার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেন এবং ছয়দফার মধ্যে সিআইএ-এর ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে যান।

মস্কো এবং বেইজিংপন্থী রাজনৈতিক দল দুটো যখন পারস্পরিক বাদ-বিসংবাদে মত্ত সেই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার প্রতি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের উঠতি মধ্যবিত্ত সমর্থন দিয়ে বসে আছে। শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্র ছয়দফার সমর্থনে প্রবল গণজোয়ারের সৃষ্টি হল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অপ্রতিহত জয়যাত্রা দেখে মস্কোপন্থী রাজনীতির অনুসারীরা যখন আওয়ামী লীগের কাছে দাবি জানালেন যে আন্দোলনে তাঁদেরও অংশীদার করা হোক, শেখ সাহেব এক বাক্যে জানিয়ে দিলেন, দলের সাইনবোর্ড পাল্টে আওয়ামী লীগে চলে আসুন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উত্তাল উত্থান পঁয়ষট্টি-পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে জেগে উঠেছিল বামপন্থী রাজনীতি তার নেতৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়ে গেল। অথচ এটা অবিসংবাদিত সত্য যে, বাঙালি জাতীয়তার বিকাশের প্রাথমিক সোপানগুলো, বামপন্থী রাজনীতির নেতা এবং কর্মীরাই নির্মাণ করেছিলেন।

নকশাল বাড়ি আন্দোলনের স্থপতি কমরেড চারু মজুমদার পশ্চিম-বাংলার কমিউনিস্ট রাজনীতিতে একটা নতুন চমক সৃষ্টি করলেন। তাঁর শ্রেণীশত্রু খতমের তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের চীনপন্থী রাজনীতির একাংশকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। আবদুল হক এবং মোহাম্মদ তোয়াহা, মওলানা ভাসানীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের একটা দল তৈরি করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের সময়ে কমরেড আবদুল হক পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ তোয়াহা এবং সুখেন্দু দস্তিদার হকের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নেতা আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন, অধ্যাপক অহিদুর রহমান প্রমুখ উত্তর-বঙ্গের আত্রাই অঞ্চলে সশস্ত্র যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের সময়েই চীনপন্থী রাজনীতির ভেতর থেকে সুদক্ষ সংগঠক সিরাজ শিকদারের আবির্ভাব। তিনি স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব-বাংলা কায়েম করার দাবিতে একাধিক সশস্ত্র সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দান করেন। সিরাজ শিকদারের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাটি কিছুকাল সক্রিয় ছিল। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওই ধারাটির অবসান রচিত হয়। রনো এবং মেননের অনুসারীরা আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে নরসিংদীর গ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ করেছেন। সংক্ষেপে এই-ই হল চীনপন্থী রাজনীতির অনুসারীদের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অবস্থানগত একটা খতিয়ান।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া একটা মস্তবড় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। মুখ্যত রাশিয়ার চাপের কারণেই বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মধ্যে সমাজতন্ত্র স্থান দখল করে নিতে পেরেছিল। সোভিয়েতপন্থী

কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, শ্রমিক ইউনিয়ন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, মহিলা সংগঠন ও কৃষক সংগঠন মিলিয়ে সমাজে তাঁদের একটা বড় রকমের অবস্থান ছিল। তাঁরা যদি ইচ্ছা করতেন, বিরোধীদল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পক্ষে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার নির্দেশে তাঁদের একদলীয় শাসনব্যবস্থা মেনে নিতে হল। এই ঘটনাটি তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উভয়কে এমন একটা অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করে, সেখান থেকে অদ্যাবধি কারো পুরোপুরি উঠে আসা সম্ভব হয়নি। সেদিন যদি কোনরকমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি চালু রাখা যেত, বাংলাদেশে একের পর এক স্বৈরশাসন জন্ম নিতে পারত না। দৃশ্যত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করা হলেও দেশটিকে বিগতদিনের দায়ভাগ অদ্যাবধি বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

বাম রাজনীতির সর্বশেষ তরঙ্গটি জেগে উঠেছিল আওয়ামী লীগ সংগঠনটিরই ভেতর থেকে। আওয়ামী লীগের নিরাপোস লড়াকু তরুণ যারা আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনরকম আপোস করতে দেয়নি, স্বাধীনতার পর তারাই আওয়ামী লীগ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সংক্ষেপে জাসদ গঠন করে। জাসদ দলটিকে বামধারার রাজনীতির সঙ্গে এক করে দেখা বোধকরি ঠিক হবে না। আওয়ামী তরুণ র‍্যাডিক্যাল অংশ থেকেই জাসদের সৃষ্টি। বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারণ করলেও অধিকাংশ্যক তরুণের তারুণ্যই ছিল তাদের প্রাণশক্তি। দলটি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল বলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেই ছিল তার প্রবল ক্ষোভ। আওয়ামী লীগকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় আসার উগ্র আকাঙ্ক্ষার কারণে কোন সুচিন্তিত রাজনৈতিক দর্শন দলটির চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। একের পর এক আত্মঘাতী উদ্যমের মধ্যে দলটি শক্তি ক্ষয় করতে থাকে। শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর সামরিক শাসন যখন চেপে বসে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা এবং কর্মীর মধ্যে একের পর এক বিভ্রান্তি জন্ম নিতে আরম্ভ করে। শেখ মুজিবের মৃত্যুর দেড় দশকের মধ্যেই দলটি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জাসদের অপমৃত্যু বাংলাদেশের রাজনীতির সব চাইতে করুণ সংবাদ। এই দলটির ছত্রখান হয়ে যাওয়ার মধ্যে একটি যুগের একটি প্রজন্মের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটে।

আট

বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তাকে ঘিরে যে সকল বিতর্ক জন্ম নিয়েছে, আসলে সেগুলো পাকিস্তান রাষ্ট্রেরই উত্তরাধিকার। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান এবং অপরাপর জাতি মিলে একটি জাতি, না দুটি জাতি, না অনেক জাতি। ব্রিটিশ ভারতে এ সমস্যাটার সমাধান হয়নি, তাই ভারতকে দু টুকরো করতে হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে জাতীয়তার সংকটটির নিরসন হয়নি বলেই পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করতে হয়েছে। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশেও সেই মৌলিক সংকটটি নানান ছদ্মবেশ ধারণ করে জাতীয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ বিশেষ সময় আসে, যখন ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জাতীয়তার প্রশ্নে বিভাজন রেখাগুলো বড় বড় ফাটলের জন্ম দেয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাকে বলা যাবে না। কিন্তু একথা তো সত্যি একটা শেকলের জোর কত তার দুর্বল কড়াটির প্রতিরোধ ক্ষমতার মধ্যেই প্রমাণ মিলে।

ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কী দেখতে পাই? ব্রিটিশ বিদায়ের প্রাক্কালে সমস্ত ভারতীয়রা মিলে একটা জাতি, তার ভিত্তিতেই ভারতীয় ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই জায়গাটিতে ভারত কি স্থির থাকতে পারছে? বিকাশমান জাতীয়তার ধারণাগুলো ভারত অস্বীকার করতে পারছে না, নতুন নতুন জাতীয়তার ধারণাগুলোর সঙ্গে ফেডারেল রাষ্ট্রকাঠামোর সংঘাত লেগেই আছে। খুব শ্লথগতিতে হলেও ভারতকে এই বহু জাতীয়তার অভিমুখে অগ্রসর হতে হচ্ছে। ভারতে যে ব্যাপারটি বিবর্তন, রূপান্তর এবং ক্রমাগত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটছে, সেই একই জিনিস পাকিস্তানে আচমকা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ঘটে গেছে। এই ঘটনার সঙ্গে সীজারিয়ান অপারেশনের তুলনা করা যায়।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান মুসলিম লীগেরই ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জন্ম নিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তার চিন্তা-চেতনায় অনেক নতুন মৌল উপাদানের সংযোজন হয়েছে। কিন্তু তারপরেও একটা জিজ্ঞাসা এখানে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। যে সামাজিক শক্তিগুলো ভারত রাষ্ট্রকে এক জাতীয়তার মধ্যে বহু জাতীয় অবস্থানের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সেই সামাজিক শক্তিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা। উত্তর হবে খুব সম্ভবত 'না'। বামপন্থী আন্দোলনের সার্বিক উত্থানই বাংলাদেশের বিবদমান সম্প্রদায়, জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব, সংঘাত কমিয়ে আনতে সক্ষম। মনে রাখা প্রয়োজন, শোষিত শ্রেণীগুলোর নেতৃত্বে রাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। সংবিধানে পঞ্চাশ পাতা লিখেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক জাতিগুলোর অধিকার দেয়া যাবে না। বামপন্থী রাজনীতির সার্বিক উত্থান ছাড়া এই দেশটির মুক্তি সম্ভব নয়। বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশের ধারাটি পর্যালোচনা করে যে সকল বাঁকে বিভক্তি, বিভ্রান্তি, বিচ্যুতি আন্দোলনের গতিবেগকে দুর্বল করেছে, ভুল পথে পরিচালিত করেছে, ঠাণ্ডা মাথায় সেগুলো চিহ্নিত করে বামপন্থীর বিকাশের নতুন সম্ভাবনাগুলো খুঁজে বের করার এখনই প্রকৃষ্ট সময়।

যে সকল কারণে বামপন্থী রাজনীতি এ দেশের প্রধান রাজনৈতিক ধারা হয়ে উঠতে পারেনি সেগুলোরও একটা খতিয়ান করা প্রয়োজন। প্রথমত, জাতিসত্তার প্রশ্নটি পাশ কাটিয়ে বামপন্থী রাজনীতি বিপ্লবের প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল এবং তাই বামপন্থী রাজনীতি জাতীয় নেতৃত্বে অবস্থান হারিয়েছে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক রাজনীতির মতাদর্শগত দ্বন্দ্বটি আমাদের দেশের বামপন্থী দলগুলো যতটা বড় করে

দেখেছে, আমাদের দেশের শোষিত জনগণের প্রশ্নটি তাঁদের চোখে সে তুলনায় গৌণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা মৌলিক উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংযোগ সাধন করে পরিবর্তনকামী শক্তিগুলো একটা জঙ্গী ঐক্যমোর্চায় টেনে আনার ব্যাপারে তারা বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। চতুর্থত, আমাদের শোষিত জনগণের সামগ্রিক স্বার্থটির প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার কারণে বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে মধ্যশ্রেণীভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কনিষ্ঠ অংশীদার হওয়ার প্রবণতা জনগণের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা অসম্ভব করে তুলেছে। পঞ্চমত, মেহনতি জনগণের সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে তাদের পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতা সামন্ত সংস্কৃতির রিক্তাবশেষকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষ সাহায্য করেছে, যা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগিতায় বারবার আমাদের সংস্কৃতির গতিধারার সুষ্ঠ বিকাশ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। ষষ্ঠত, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানস-চৈতন্যের শুশ্রূষা করে তার মান উন্নত এবং বোধ উপলব্ধিতে নতুন সমাজের ভ্রূণ গ্রহণ করার পরিবেশ সৃষ্টি না করে অনুভূতিকে আহত করার প্রবণতা বৃহত্তর জনগণকে বামপন্থীর প্রতি বিমুখ করে তুলেছে। সপ্তমত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক জাতিসমূহের নিরাপত্তা এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের অধিকারের প্রতি যথেষ্ট অঙ্গীকারসম্পন্ন না হওয়ার কারণে, তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি জন্ম দিয়েছে। অষ্টমত, বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং নেতৃবৃন্দ সমস্ত জাতির নেতৃত্ব দেয়ার বদলে সমাজে বিশেষ বিশেষ অংশকেই কর্মক্ষেত্র মনে করেন বলে তাঁরা একটি পলায়নবাদী, পরাজিত মানসিকতার শিকারে পরিণত হয়েছেন। সে কারণে বামপন্থী রাজনীতিকে আমাদের রাজনীতির প্রধান ধারা হিসেবে তাঁরা চিন্তা করতেও সক্ষম নন। নবমত, বিশ্বপরিসরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতন আদর্শিকভাবে আমাদের বামপন্থী দলগুলোর নেতা এবং কর্মীদের হতবিহ্বল করে ফেলেছে। তাই তাঁরা আমাদের শোষিত জনগণের উত্থানক্ষমতার প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। দশমত, বাজার অর্থনীতির জয়যাত্রা বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং অর্থনীতিবিদদের একাংশকে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছে। তাঁরা জনগণের শ্রমনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের পথ পরিহার করে বাজারের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করছেন। তাঁদের এ দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। বিকল্প অর্থনৈতিক যুক্তি নির্মাণে বামপন্থী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এ সকল আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ধনী দেশগুলোর স্বার্থকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষিতটি তাঁরা উপেক্ষা করে থাকেন। একাদশতম কারণ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের জনউদ্যোগ এবং সামাজিক সংহতি বিনষ্ট করার বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। আমাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এ পর্যায়ে হয়ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ যেভাবে সরকারের উত্থান-পতনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে, তাঁদের এ ক্ষতিকারক ভূমিকার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামাজিক প্রতিরোধ প্রয়োজন। তারাই বামপন্থীর বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে।

প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী সমাজবিজ্ঞানী ড. লেনিন আজাদ 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' এর নতুন একটি সংস্ককরণ প্রকাশ উপলক্ষে বারবার চাপ প্রয়োগ করে আমাকে এই সুদীর্ঘ সাম্প্রতিক বিবেচনাটি লিখতে প্ররোচিত করেছেন। আদ্যোপান্ত লেখাটি কম্পিউটার টাইপ করার কাজে আমার সহকর্মী রতন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র আনোয়ার সব ধরনের ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করেছে। তাদের প্রতি রইল আমার শুভাশিস্।

উত্থানপর্ব কার্যালয়
৭১ আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

আহমদ ছফা
১৫ আগস্ট, ১৯৯৭

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' এর লেখক আহমদ ছফা বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের কতকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের বিশিষ্ট মানসিকতার বিবর্তনের ধারা এই প্রবন্ধ সংকলনটিতে কিছুটা আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাকে মূলত বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদেরই একজনের স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা নিঃশঙ্ক সমালোচনা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সুবিধাবাদের একটা ঝোঁক যে তাঁদের একটা শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য এ বিষয়ে এই তরুণ লেখকের যে কিছুমাত্র সংশয় নেই সেটা তাঁর লেখায় প্রতিটি ছত্রে সুস্পষ্ট, কিন্তু তবু তিনি স্বদেশের বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সুবিধাবাদিতায় নিদারুণভাবে বিক্ষুব্ধ। তাঁর এই বিক্ষোভের কারণ একদিকে মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যে সুবিধাবাদের সাধারণ আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোপুরি এবং অনেক ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সুবিধাবাদ উত্তীর্ণ হতে সক্ষম, এই ধারণার প্রতি তাঁর গভীর আস্থা এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের এই শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের বাস্তব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটা সামগ্রিক ও দিগন্তপ্রসারী সুবিধাবাদের অবাধ রাজত্ব। বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ সুবিধাবাদের পাশাপাশি তাঁদের একাংশের সুবিধাবাদ উত্তীর্ণতার যে সন্ধান তিনি করেছেন সেই সন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার মধ্যে তাঁর বিভিন্ন বিক্ষুব্ধ মন্তব্যের মর্মকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং সে চেষ্টা করলে বর্তমান বাংলাদেশে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীভুক্ত জনগণের জীবনকে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত করছে তারও কতকগুলো মূলসূত্রের সন্ধান এ প্রবন্ধগুলোর মধ্যে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আহমদ ছফা শ্রেণী বিশ্লেষণের কোন চেষ্টা করেননি। কিন্তু দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির সাথে ওতপ্রোত যোগসূত্রে আবদ্ধ একথা তিনি স্বীকার করেছেন এবং এই স্বীকৃতির ওপরই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির প্রাথমিক ভিত্তি। কোন লেখক যদি নিশ্চল সততা এবং নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়কে অবলম্বন করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সাংস্কৃতিক জীবন এবং সংস্কৃতি চর্চার যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন তাহলে সংস্কৃতি চর্চাকে তিনি শেষ পর্যন্ত একটা শ্রেণীগত কর্মকাণ্ড বলে সিদ্ধান্ত করতে দ্বিধাবোধ করবেন না এবং নিজের বিশ্লেষণকে আরো সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে আলোচনাকে সামগ্রিকভাবে শ্রেণী

বিশ্লেষণের ওপর দাঁড় করাবেন। আহমদ ছফা এই সংকলনের প্রবন্ধগুলোতে আলোকিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে যেহেতু মোটামুটিভাবে সঠিক ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়েছেন সেজন্য এটা আশা করা অবাস্তব হবে না যে ভবিষ্যতে তিনি তাঁর সমালোচনার ক্ষেত্রে শ্রেণী বিশ্লেষণের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করবেন।

বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষত 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ' বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে নির্লজ্জতা, ভণ্ডামি, কাপুরুষতা এবং সুবিধাবাদ আজ দোর্দণ্ডপ্রতাপ তা শুধু বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। এই প্রবণতা বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক জীবন থেকে রস সংগ্রহ করেই আজ দিকে দিকে অংকুর থেকে পরিণত হচ্ছে মহীরুহে। তথাকথিত সংস্কৃতি চর্চার নামে যে কদর্য বেহায়াপনা এবং আত্মসেবা এ দেশের 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ' বুদ্ধিজীবীরা আজ করে চলছেন সে বেহায়াপনা এবং আত্মসেবা রাজনীতিবিদদের বেহায়াপনা এবং আত্মসেবার সাথে অবিচ্ছিন্ন। সামগ্রিকভাবে এ দেশের সাম্রাজ্যবাদকবলিত বুর্জোয়াশ্রেণী আজ যে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে জ..স্বার্থ পদদলিত করে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ পুষ্ট করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তারই একটা সুস্পষ্ট চিত্র মধ্যশ্রেণীভুক্ত এই বুদ্ধিজীবীদের সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে পাওয়া যায়।

লেনিন বলেছেন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে যারা শ্রেণীনিরপেক্ষ বলে কলাকৈবল্যবাদ প্রচার করে তারা নির্মম ভণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই যারা এক্ষেত্রে কলাকৈবল্যবাদের কথা বলে তারা আসলে শোষকশ্রেণীর সাহিত্য-সংস্কৃতি, তাদের কাব্যচর্চা ইত্যাদির সঠিক শ্রেণীচরিত্রকে শোষিতশ্রেণীর চোখের আড়াল করার উদ্দেশ্যেই তা বলে থাকে। কিন্তু তবু কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখি শোষকশ্রেণীভুক্ত এই সমস্ত সংস্কৃতিসেবীদেরকে নিজেদের মুখোশ অনেকখানি ছিঁড়ে ফেলতে, নির্লজ্জ এবং নগ্নভাবে শাসকশ্রেণী অর্থাৎ তাদের নিজেদেরই শ্রেণীর বড় তরফের ভাড়া খাটতে। আমাদের দেশেও আমরা পাকিস্তানি আমলে, বিশেষত সামরিক শাসনের আমলে, তা দেখেছি। অনেকে ভেবেছিলেন যে, পূর্ব-বাংলায় একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু তাঁদের সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা উদ্ভূত বিক্ষোভই আহমদ ছফা'র প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে। 'তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে' প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রে এই ভাড়াখাটা সংস্কৃতিসেবীদের স্বদেশপ্রেম ও আত্মপ্রেম ন্যক্কারজনকভাবে একাকার হতে দেখে তিনি অনেকখানি উত্তেজিত হয়েই এই সংকলনে স্থানপ্রাপ্ত প্রবন্ধগুলো রচনা করেছেন।

কিন্তু একটি জিনিস এখানে উল্লেখ না করলে এই ভূমিকা বহুলাংশে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কথাটি হল : মধ্যশ্রেণীভুক্ত হোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের এবং তরুণ ও ছাত্র সম্প্রদায়ের এক ব্যাপক অংশের উপরোক্ত চরিত্র লক্ষণসমূহকে একেবারে সার্বজনীন মনে করা আজকের এই বাংলাদেশেও অসঙ্গত। আমরা জানি, আমাদের দেশের হাজার হাজার মধ্যশ্রেণীভুক্ত যুবক ও ছাত্র কিভাবে স্বদেশকে ভালবেসে, স্বদেশের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারকে অর্জন ও সমুন্নত রাখার জন্যে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত থেকেছেন, প্রয়োজনে তা বিসর্জন দিয়েছেন। একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র

হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও তাঁরা নিজেদের আত্মসম্মান বিসর্জন দেননি। মধ্যশ্রেণীভুক্ত এই তরুণদের মধ্যে আজ অনেকেই নতুনভাবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামকে সংগঠিত করার কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে উন্মুখ। অনেকে এ কাজে ইতোমধ্যেই নিযুক্ত। যে-কোন দেশেই বিপ্লবের প্রাথমিক স্তরে শ্রমিক-কৃষকের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনাকে উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, এঁদের এই প্রাথমিক ভূমিকা ব্যতীত কোন দেশে আজ পর্যন্ত কোন বিপ্লব উপযুক্তভাবে সংগঠিত ও সফল হয়নি।

বাংলাদেশে আজ সাহিত্য ও কাব্যচর্চা এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ওপর তলায় সুবিধাবাদের যে নৈরাজ্য দেখা দিচ্ছে সেটা ওপর তলারই ব্যাপার। সামগ্রিক বিচারে তার গুরুত্ব তেমন বেশি নয়। রাজনৈতিক সংগ্রামের তুফানে এই সমস্ত সংস্কৃতি-সেবীরা অতীতের মত ভবিষ্যতেও খড়-কুটোর মত উড়ে যাবে। তাই আজ ওপর তলার এই সমস্ত ভাড়াখাটা সংস্কৃতিসেবীদের সমালোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য হলেও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সমালোচনা এবং সংস্কৃতি-চর্চার মূল উদ্দেশ্য হতে হবে, যে সমস্ত নতুন ও তরুণরা সম্পত্তি সংগ্রহের ঝোঁক অতিক্রম করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃতি চর্চা করতে, রাজনীতি সংগঠিত করতে এগিয়ে আসছেন তাঁদের সহায়তা করা। তাঁদের উন্মেষ ও কর্মক্ষেত্রকে সাহায্য ও প্রসারিত করা।

আহমদ ছফাও তাঁর এই সংকলনটির শেষে এই ধরনেরই একটা কথা বলেছেন। আশা করা যায় তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ রচনাসমূহের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত প্রগতিশীল লেখকদের কর্মকাণ্ডের প্রতিই নিজের দৃষ্টিকে অধিকতর নিবদ্ধ রাখবেন।

বদরুদ্দীন উমর

৩/১২/৭২

দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষ যখন বিলাপে, স্মৃতিচারণে, কৃতিত্বের রোমন্থনে কিংবা চাটুকারিতায় নিরত, অথবা প্রাণভয়ে বিব্রত, তখন আহমদ ছফা 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস,' চিন্তায় নিষ্ঠ। সংগ্রামোত্তর দলিত জীবনে প্রাণশক্তির উন্মেষ ও ঋদ্ধির এবং মনন বিকাশের আবশ্যিকতা এমনি করে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আর কেউ ভাবেনি।

আহমদ ছফা বয়সে কাঁচা, মনে পাকা, সঙ্কল্পে অটল। দৃষ্টি তার স্বচ্ছ, বাক্য তার ঋজু, বক্তব্য স্পষ্ট, উদ্দেশ্য তার সাধু। মাটি ও মানুষের প্রতি প্রীতিই তার কল্যাণকামিতা ও কর্মপ্রেরণার উৎস এবং তার প্রাণ শক্তির আকর। এজন্যেই ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে সে সত্য কথা বলার সৎসাহস রাখে। এবং গুণই তাকে আজকের লিখিয়ে-বলিয়েদের সমাজে অনন্য করেছে। লিখিয়ে হিসেবে সেও শেলীর মত বলতে পারে— fall upon the thorns of life. I bleed, অথবা, নজরুলের মত সেও যদি বলে—

'গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা'
দংশিল সর্বাঙ্গ মোর নাগ নাগ বালা।'

তবে অত্যুক্তি হয় না। সুবিধাবাদীর 'Life is a compromise' তত্ত্বে ছফার আস্থা নেই। আজকের বাংলাদেশে এমনি স্পষ্ট ও অপ্রিয়ভাষী আরো কয়েকজন ছফা যদি আমরা পেতাম, তাহলে শ্রেয়সেয় পথ স্পষ্ট হয়ে উঠত।

মানববাদী ছফার 'সূর্য তুমি সাথী', 'নিহত নক্ষত্র', 'ওঙ্কার', 'জাগ্রত বাংলাদেশ' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'-এর তাৎপর্য ও গোড়ার কথা সহজেই বুঝবেন এবং সংস্কৃতি-প্রাণ, মানবদরদী ছফাকে উগ্রপ্রতিবাদী বলে ভুল করবেন না। হিতচেতনাদানই এ গ্রন্থের লক্ষ্য, যা ছফা বা যে-কোন সৎলিখিয়ের কর্তব্য।

ডক্টর আহমদ শরীফ
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর, ১৯৭২

লেখকের কথা

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন রক্ত দিয়েই চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি। চারদিকে এত অন্যায়, অবিচার এত মূঢ়তা এবং কাপুরুষতা ওঁৎ পেতে আছে যে এ ধরনের পরিবেশে নিতান্ত সহজে বোঝা যায় এমন সহজ কথাও চেঁচিয়ে না বললে কেউ কানে তোলে না। এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থে যা বলেছি সব আমার কথা নয়। হামেশাই যা আলোচিত হতে শুনেছি তাই-ই একটু জোর দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি। তাও সবসময় পেরেছি তেমন দাবি করতে পারব না। সৎ সাহসকে অনেকে জ্যাঠামি এবং হঠকারিতা বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু আমি মনে করি সৎ সাহস হল অনেক দূরবর্তী সম্ভাবনা যথাযথভাবে দেখতে পারার ক্ষমতা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের যাবতীয় তত্ত্ব এবং তথ্য আমি কোথাও না কোথাও থেকে আহরণ করেছি, কেবল উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করার সাহসটুকুই আমার ব্যক্তিগত বিনিয়োগ। দৈনিক 'গণকণ্ঠে' যখন লেখাটা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল অনেকে প্রশংসা করেছেন, অনেকে নিন্দা করেছেন। নিন্দা-প্রশংসার প্রত্যক্ষ কারণ বলে যা মনে করি, অসংকোচে আমাদের সংস্কৃতির কতিপয় প্রখ্যাত অমানুষের নাম-সাকিন উল্লেখ করতে পেরেছিলাম। কুৎসার প্রতি মানব সাধারণের মমতা তো সুবিদিত। বই আকারে বের করার সময় নামগুলো ছেটে দিলাম। সুযোগ সন্ধানীরা অল্প-বিস্তর চিরকাল থাকে। মোটা বুদ্ধি, ভোঁতা অনুভূতি, পুরো চামড়াই তাদের টিকে থাকার মূলধন। তার বাইরেও দেশের মানুষের হয়ে, অকৃত্রিমভাবে কিছু অনুভব করতে চেষ্টা করেছি। কবি আল মাহমুদ ব্যক্তিগতভাবে যত্ন নিয়ে লেখাটা দৈনিক 'গণকণ্ঠে'র জন্য আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, তার কাছে এবং 'গণকণ্ঠে'র বন্ধুদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধেয় বদরুদ্দীন উমর সদয় হয়ে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে বইটি বের করতে হয়েছে এবং আমি একেবারে আনাড়ি প্রুফ রিডার বলে অনেকগুলো মারাত্মক মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল।

আহমদ ছফা

২০৬ আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৫.১২.৭২

বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস

বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। এখন যা বলছেন, শুনলে বাংলাদেশের সমাজ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না।

আগে বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানি ছিলেন, বিশ্বাসের কারণে নয়— প্রয়োজনে। এখন অধিকাংশ বাঙালি হয়েছেন— সেও ঠেলায় পড়ে। কলাবরেটরদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা অন্ধভাবে হলেও ইসলাম, পাকিস্তান ইত্যাদিতে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে। আবার স্বাধীন বাংলাদেশে চতুঃস্তম্ভের জয়ধ্বনি দিচ্ছেন, এমন অনেক বুদ্ধিজীবী রয়েছেন, যাঁরা সারাজীবন কোনকিছুতে যদি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পেরেছেন— সে বস্তুটির নাম সুবিধাবাদ।

মামুলিভাবে বলা হয়ে থাকে, বুদ্ধিজীবীরা তো সুবিধাবাদীই। সুতরাং তাঁদের কোন কর্ম নিয়ে হৈ চৈ করা পণ্ডশ্রম। সুবিধাবাদই বুদ্ধিজীবীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কথাটা যদি সর্বাংশে সত্য হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে সমাজে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সত্যি-মিথ্যে, উচিত-অনুচিতের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই।

একটা সমাজের একটা বিরাট পরিবর্তনের পূর্বাহ্ণে বুদ্ধিজীবীদের কি ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত? বাংলাদেশের আজকের যাঁরা নামকরা বুদ্ধিজীবী, তাঁরা কি আদৌ তাঁদের ভূমিকা পালন করেছিলেন? প্রমাণ হাতের কাছেই রয়েছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা কিছু কিছু পোশাকি ভূমিকা পালন করেছেন, একথা স্বীকার করতেই হবে। যেমন রবীন্দ্র সঙ্গীত, রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর হামলা, বর্ণমালা সংস্কার প্রচেষ্টার প্রশ্নে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা একাট্টা হয়ে সামরিক সরকারের আরোপিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। এটা একদিক— এ দিকটাকে আমরা পোশাকি বলেছি। কারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এত অধিক হারে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, বুদ্ধিজীবীদের চুপ করে থাকার কোন উপায় ছিল না। তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু প্রতিবাদ করার কারণে দুয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া কাউকে চাকরি হারাতে হয়েছে অথবা জেলে যেতে হয়েছে এমন কোন মানুষের নাম আজও জানার সৌভাগ্য হয়নি। অথচ শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজের এমন অনেক গভীর, বিকট হাঁ করা প্রশ্ন ছিল, যে সকল বিষয়ে একজন কি দুজন ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠাবান বুদ্ধিজীবীই উচ্চবাচ্য করেননি। কেন এমন হল? জবাবে সেই প্রথম কথাই এসে পড়ে। বুদ্ধিজীবীরা সুবিধাবাদী, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিপদ-আপদ এড়িয়ে চলাই স্বভাব। তাঁদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। সচরাচর এমনই হয়ে থাকে।

সেই সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি রকম ছিল? খুব বেশিদিনের কথা নয়— স্মৃতিতে এখনো তাজা রয়েছে। সামরিক সরকার গণতান্ত্রিক অধিকার কালো

থলিতে পুরেছে, প্রতিদিন ধরপাকড় চলেছে, প্রতি মাসে গুলি চলেছে, প্রতি বছরেই জনগণের রুদ্ররোষ উথলে উথলে উঠেছে। এসবের মধ্যে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা কোন জাতীয় সম্ভাবনা আঁচ করতে পারেননি। বাংলাদেশ যে স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে, আমাদের কোন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের কল্পনায় আভাসিত হয়নি। দুই যুগ, এক যুগ, ছয় যুগ, দুই বছর এমনকি এক বছর আগের লেখা কোন বইতে বাংলাদেশ যে স্বাধীন হতে পারবে, তার ছিটেফোঁটা উল্লেখও দেখতে পাচ্ছিনে।

বাংলাদেশের জনগণই বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি। ঘটনা ঘটেছে ঘটনার নিয়মে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তার কোন তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া হয়নি। বাংলাদেশের নির্দেশনা ব্যতিরেকেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে একটা কথা আছে না, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে তা আরো একবার সত্যে পরিণত হয়েছে। সকল ঘটনা ঘটে যাবার পর সকলে আপনাপন গর্ত থেকে শেয়ালের মত বেরিয়ে সমস্বরে জয়ধ্বনি তুলছেন। চিন্তাশীলতার লক্ষণই তো হল সমাজের নানামুখী স্রোতের গতিধারা অনুধাবন করে একটা সামঞ্জস্য বিধান করার প্রচেষ্টা। বাঙালি জনগণের চেতনার ঘনত্ব অনুধাবন করতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবৃন্দ কি সত্যি সত্যি অক্ষম ছিলেন? যদি তা না হয় গোটা বাঙালি জাতির ইতিহাসে এমন একটি অভূতপূর্ব ঘটনা অনতিবিলম্বে ঘটতে যাচ্ছে, অন্তত যার জলছবিটিও কোন সাংস্কৃতিক প্রয়াসের মধ্যে ছায়াপাত করল না কেন? ঘটনা ঘটলে তারপর চিন্তা করতে বসবে— সকলের ক্ষেত্রে এ কেমন করে সত্য হয়? আমাদের দেশে আগামী চিন্তা করতে পারে এমন কোন মানুষ কি ছিলই না? সংস্কৃতি বাস্তব রাজনীতিকে পথ দেখিয়ে থাকে— তা কি আমাদের দেশে মিথ্যে হয়ে গেল?

এই সকল বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে। কেননা, চিন্তা কাজের সূক্ষ্ম শরীর। আমাদের সমাজ একটি পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সমাজের খোল-নলচে দুই-ই বদলে নতুন সমাজ সৃজন করার জোরাল দাবি সমাজের মর্মমূল থেকেই তীব্রবেগে স্ফুরিত হয়েছে। এই সৃজন প্রক্রিয়াতে বেগ এবং পূর্ণাঙ্গতা দান করতে হলে, রাজনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরও প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের মানুষ সমৃদ্ধিশালী, সুখী একটি মানবসমাজ, একটি তৃপ্তিধারার সভ্যতা নির্মাণ একটি বলবন্ত ফলন্ত সংস্কৃতির অধিকারী হওয়ার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই নতুন সমাজের দুটি দিক। এক রাজনীতি, দুই সংস্কৃতি। একে-অপরের পরিপূরক। একে-অপরের থেকে চলার পথের গতি এবং প্রাণরস আহরণ করে। রাজনীতিতে যেমন, তেমনি সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রথম ধাপ হল অতীতের সংস্কৃতি প্রবাহ বিচার বিশ্লেষণ করে তার হাঁ ও না-এর দিক চিহ্নিত করা এবং প্রাণের ইশারাটুকুতে গতিময়তা দান করা।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা অতীতে তাঁদের সামাজিক ভূমিকা যথাযথ পালন করতে পারেননি, একথা সত্যি। সেজন্য তাঁদের একতরফা দোষারোপ করলে কোন

লাভ হওয়ার কথা নয়। কোন সমাজে কোন বিশেষ ব্যক্তি যদি তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে না পারেন— তার জন্য সে ব্যক্তি এবং সে সমাজ উভয়েই দায়ী। কারণ, ধরে নিতে হবে সে সমাজের এমন কোন ক্ষমতা নেই, যার বলে ব্যক্তিকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে পারে অথবা ব্যক্তির মনে এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে অপারগ, যার ফলে ব্যক্তি আপনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা প্রাক-স্বাধীনতা কালে তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন নি— তা অত্যন্ত নিন্দনীয়; কিন্তু কেন পারেননি, কারণগুলো নির্মোহভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

পাকিস্তান আমলের গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। পাকিস্তান হওয়ার পরপরই এ দেশে একটা সাংস্কৃতিক 'এলিট' শ্রেণী সৃষ্টি হতে থাকে। দুনিয়ার বুকে পাকিস্তান একটা বিসংগত রাষ্ট্র— এই রাষ্ট্রের সরকারি দর্শনও বিসংগত। ইসলাম, মুসলিম জাতীয়তা, ইসলামি রাষ্ট্র এসব গালভরা মনোহর মিথ্যে বুলিই ছিল পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীদের অত্যন্ত আদরের জিনিস। তাঁরা এসব কপচাতেন এ কারণে নয় যে, সত্যি সত্যি এগুলোর প্রতি কোন মমতা ছিল— কিংবা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। রাষ্ট্রীয় দর্শন আওড়ালে, প্রশংসা করলে পয়সা পাওয়া যেত। তাই তাঁরা দরাজ গলায় অমন একনিষ্ঠভাবে রাষ্ট্রীয় দর্শনের গুণ বাখান করতেন। গল্প, উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী থেকে প্রাইমারি স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত তাঁদের পক্ষাঘাতদুষ্ট মনোভঙ্গির অক্ষয় রাজত্ব। প্রতিবাদ করার কেউ ছিল না। প্রতিবাদ করলে উপোস করতে হত, প্রতিবাদ করলে জেলে যেতে হত। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় দর্শনকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি এবং বিদগ্ধজন কত অকাজ-কুকাজ করেছেন একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। বাংলা-সাহিত্যের একটি ইতিহাস লেখা হয়েছিল। এবং ইতিহাসটি ছাত্র-ছাত্রীদের এখনো পড়ানো হয়। তাতে অনেক স্থলেই প্রকৃত ইতিহাসকে হত্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের হল ইতিহাসকারদ্বয় জেনেশুনেই সত্যকে হত্যা করেছেন। বর্তমান সময়ে বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছে গ্রন্থকারদের থাকার কথা নয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তো বইটি পাঠ্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়ার দিকে ইসলামি রাষ্ট্র নামের ব্যঞ্জনায় কেউ মোহিত হয়ে, কেউ বাধ্য হয়ে, কেউ প্রতিপত্তির কারণে, কেউ লোভে পড়ে, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। এই রকম একটা আবহাওয়া পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীরা সৃষ্টি করেছিল বলেই পশ্চিমারা অত সহজে কোন রকমের আগ পাছ চিন্তা না করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালিয়ে দেবার দুঃসাহস করেছিল। তার ফল অজানা নয় কারো। যা বিনা কথাতে পাওয়া উচিত, তার জন্য রক্ত দিতে হল। শুরু থেকেই একটা জিনিস পরিষ্কার আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশের জনসাধারণ ভুল করেননি এবং খুব কমই বিভ্রান্ত হয়েছেন। যখনই কোন সরকারি সিদ্ধান্ত তাঁদের স্বার্থের এবং বাস্তবজীবনধারার বিপক্ষে গেছে তাঁরা

কোমর বেঁধে পৌরুষের সাথে প্রতিবাদ করেছেন। জনগণের চিন্তাধারায় অগ্রসরমানতা এবং পরিচ্ছন্নতা দেয়ার মত কোন সাংস্কৃতিক প্রয়াস হয়নি বললেই চলে। এখানে একটা কথা বলে দেয়া প্রয়োজন, ভাষার প্রশ্নে আমাদের দেশের কোন পণ্ডিত বাংলাভাষার স্বপক্ষে মতামত রেখেছিলেন, কিন্তু তা এত ক্ষীণ, অস্পষ্ট এবং সংশয়াচ্ছন্ন যে, জনগণের মধ্যে তার খুব সামান্যই প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সুতরাং যা ঘটবার ঘটে গেল। ছাত্র তরুণেরা প্রাণ দিল— দেশে আগুন জ্বলে উঠল। আর কবি-সাহিত্যিকেরা শোকসভায় সভাপতির আসন দখল করলেন— প্রবন্ধে-কবিতায় এক কলসি করে অশ্রু বিসর্জন করলেন।

উনিশ শ' বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের পর পর এ দেশের সংস্কৃতির একটা পট-পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতিপয় স্পর্ধিত তরুণের আবির্ভাব লক্ষ্য করি। তাঁদের দেখবার চোখ, চিন্তা করার ভঙ্গি, বিচার করার পদ্ধতি পাকিস্তানিবাদী বুদ্ধিজীবী ও শিল্প-সাহিত্যের মুরুব্বিদের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্মের জং ধরা খোলস প্রাণশক্তির তোড়ে ফাটিয়ে ফেলার যে স্পর্ধিত স্পৃহা তাঁদের মধ্যে দেখা গেছে তা প্রশংসা করার মত। কিন্তু ঝিলিক দেয়াটাই সার। আজকের দিনে বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, তাঁদেরকে পরিণত চিন্তার অধিকারী এবং স্থিতধী দিকদ্রষ্টা হিসেবে দেখতে পাওয়াটা খুবই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বাস্তবের সংঘাতে জাতির সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বাংলাদেশে সংস্কৃতির যে নতুন সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তার গতিবেগ মন্দা হয়ে আসে। সে সুবাদে পাকিস্তানের প্রবক্তা বুদ্ধিজীবীরা, শিল্প-সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁদের টলটলায়মান আসনগুলোতে নড়ে-চড়ে শক্ত হয়ে জেঁকে বসেন। গোটা বাংলাদেশে তাঁরা অর্ধ-বর্বরসুলভ চিন্তা-চেতনা চাপিয়ে দিতে থাকলেন। এ ব্যাপারে সে সময়কার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকেও দায়ী না করে উপায় নেই। রাজনীতির উত্থান-পতনে, জয়-পরাজয়ে সংস্কৃতির যে-কোন ভূমিকা থাকতে পারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আদপেই সে ব্যাপারে কোন ধারণা ছিল মনে হয় না। রাজনৈতিক দলগুলোর সাধারণ কর্মীদের সাংস্কৃতিক চেতনাহীনতা, ইতিহাস-ভূগোলের জ্ঞানের অভাবের দরুন তাঁরা নেতৃমোহে তাড়িত হয়েছেন এবং নেতারা ডন কুইকসোটে পরিণত হয়েছিলেন। একটি সমাজের সর্বাঙ্গীণ গতির নাম রাজনীতি এবং সংস্কৃতি রাজনীতির রস-রক্ত, এই বোধে কোন রাজনৈতিক দল কিংবা লোকমান্য নেতার মন সিঞ্চিত হয়েছে, তেমন কোন দল বা ব্যক্তিত্বের নাম আজও জানা হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কৃতিবিমুখতা, কর্মীদের চেতনাহীনতা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিকে দুটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করল। ফরাসি লেখক আলফাস দোঁদের একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। ফরাসিরা যুদ্ধে মার খেয়েছে, গল্পের নায়ক খুবই আশাহত হয়ে পড়েছে, আরেকজন তাঁকে উপদেশ দিচ্ছে ফরাসি সাহিত্য পড়ার। তার মানে ফরাসি সাহিত্যের মধ্যে এমন কিছু প্রাণদায়িনী উপকরণ রয়েছে, যার প্রভাবে নায়ক যুদ্ধে পরাজয়ের হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

পুরোপুরি না হোক, আংশিকভাবেও যদি আমাদের জাতি এই মনোভঙ্গি আয়ত্ত করতে না পারে, তাহলে বলতে হয় আমাদের বর্বর-দশা এখনো কাটেনি। ভাষা আন্দোলনের পরে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা হত পোকায় কাটা প্রাচীন কাব্য অনুগত ছাত্রদের ফিসফিস করে পড়ানোর মধ্যে, অবসরভোগী চাকরেদের অলস বিশ্রান্তালাপে, মেদবহুল বাংলার অধ্যাপকের রেডিও টকের বাগবিস্তারে এবং রবীন্দ্রবিলাসী মহিলাদের পূর্ণিমাবাসর রচনায়। কখনো কখনো দুয়েকটি ব্যতিক্রমী পত্র-পত্রিকা চোখে পড়ত। গোটা দেশের বিচারে তা আর কত।

রাজনীতি আর সংস্কৃতি আলাদা হয়ে পড়লেও বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি এমনভাবে প্রাণ স্পন্দনহীন হয়ে থাকার কথা ছিল না। যেটুকু প্রাণের লক্ষণ ছিল মার্কিন ডলার একেবারে থেতলে দিয়ে গেল। মার্কিন দূতাবাস বাংলাদেশের অধ্যাপক, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিকদের চড়া দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেল। যে লেখক একটা গল্পের বই কিংবা উপন্যাস প্রকাশ করে বছরে দু' শ' টাকা আয় করবার ভরসা করতে পারতেন না, সেই একই লেখক মার্কিন বইয়ের সের মাপা অনুবাদ করে মাসে আড়াই হাজার কামাতে লাগলেন। মার্কিন দূতাবাস বেছে বেছে সমাজতন্ত্রীদের বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা বই-ই অনুবাদ করাত। এ পর্যন্ত মার্কিনীরা হাজার হাজার বই অনুবাদ করিয়েছে। তার মধ্যে আঙ্গুল গুণে বলা যাবে— ক'টি সৎ সাহিত্য। সে ক'টিও অনুবাদ করিয়েছে পাছে লোকে মনে করে মার্কিনীরা কেবল প্রোপাগাণ্ডাই অনুবাদ করায়। বাংলাদেশের যে সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সমালোচকের নাম এখন হামেশা শোনা যায়, তাঁদের শতকরা আশি ভাগই মার্কিনী প্রচারের অনুবাদ করেছেন। এটা খুবই দুঃখের কথা যে আমাদের সংস্কৃতির যাঁরা শ্রদ্ধেয় লোক বলে খ্যাত— অনেকেই মার্কিনী অর্থের বিনিময়ে মানসিক দাসত্ব করেছেন এবং তা আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণ-সংগ্রামের বিপক্ষে গেছে। আমেরিকান দূতাবাসের সহজ টাকা না পেলে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মানসিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতেন। তা আমাদের শিল্প-সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মোচন করত। আর অনূদিত বইগুলো মার্কিনীরা জ্ঞান বিতরণের ছল করে স্কুল-কলেজে এবং সাধারণ পাঠাগারসমূহে বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের গণ-সংগ্রাম বিরোধী বই অধিক পাঠের ফলে আমাদের জনগণের চেতনা, চিন্তা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে।

তালিকা যদি ক্ষুদ্র হত নাম উল্লেখ করতাম কোন খ্যাতনামা কবি, কোন নামি অধ্যাপক আমেরিকার টাকায় দেশের বিরোধিতা করলেন! কোন রকমের দ্বিধা না করেই বলে দেয়া যায়, দু' চারজন বাদে আজকের বাংলাদেশের নামকরা শিক্ষক-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের বেশিরভাগই জীবনের একসময়ে না এক সময়ে মার্কিন প্রচার অনুবাদ করেছেন। এমন নজির আমাদের আছে, কেউ কেউ দুর্নামের ভয়ে নিজের নামের বদলে মেয়ের স্বামী, ছোট ভাই এবং অর্ধাঙ্গিনীর নাম পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল এবং নেতৃবৃন্দের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা ও দূরদর্শিতার অভাবের দরুন ধীরে ধীরে সংস্কৃতি এবং রাজনীতি একে-অপরের পরিপূরক না হয়ে

দুটি আলাদা জলঅচল কুঠুরিতে পরিণত হল। রাজনীতি হল মানুষ ফাঁকি দিয়ে ভোটে জেতা, ক্ষমতা দখলের অস্ত্র আর সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদের, উড়নচণ্ডী কবি-সাহিত্যিকদের বিলাসের, চিত্তবিনোদনের উপায় হয়ে দেখা দিল। এই সময়ে জঙ্গীলাট আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করলেন।

তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিয়ে মৌলিক গণতন্ত্রী শ্রেণী সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন আমলা এবং টাউট শ্রেণী। আইয়ুবের সিংহাসন ধরে ঝুলে থাকা এই শ্রেণীসমূহের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীদেরও একটা শ্রেণী একনায়ক নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করে নিলেন। আইয়ুব খানের রাজত্বে বুদ্ধিজীবীরা একটা আলাদা শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিজীবীরা সম্পূর্ণ একটা শ্রেণী হিসেবে মাথা তুলেছে তা নয়— জঙ্গীলাট নিজের প্রয়োজনে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে কারবার করেন এমন মানুষের মধ্যে মাথামোটাদের বেছে নিয়ে আলাদা একটা শ্রেণী দাঁড় করালেন।

শিক্ষকদের মধ্যে, সাংবাদিকদের মধ্যে, সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি সুবিধাভোগী কতিপয় মানুষ বাছাই করলেন। তাঁদের বাড়ি, গাড়ি, অধিক মাইনে, বিদেশ ভ্রমণ এবং পরিতোষিকের সুযোগ-সুবিধে করে দিলেন। হিসেব করলে দেখা যাবে, যে সময়ে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা নিকৃষ্টতম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, সেই সময়েই এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অঢেল সরকারি সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে রাতারাতি চেকনাইওয়ালা হয়ে উঠেছেন। আইয়ুব রাজত্বে দুর্নীতিবাজ মৌলিক গণতন্ত্রী দেশের জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে পোষা যেমন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের পুষে সাংস্কৃতিক উজ্জীবন বন্ধ করাও একটা প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং শিক্ষকতার ক্ষেত্রে আইয়ুব খান এমন কতিপয় চেকন-মোটা পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, যার ফলে অধিকাংশ চক্ষুষ্মান ব্যক্তি চড়া দামে আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য অথবা প্রলুব্ধ হলেন।

সাংবাদিকতার কথাই ধরা যাক। সাংবাদিকদের টাকা দিয়ে হাত করার জন্য আইয়ুব খান প্রেস ট্রাস্ট, ফিচার সিন্ডিকেট ইত্যাদির জন্ম দিলেন। অন্যান্য দৈনিক কাগজে যে পরিমাণ মাইনে দেয়া হয়, তার দুই গুণ তিন গুণ মাইনে প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকার কর্মচারীদের দিতে থাকলেন। জঙ্গীলাট বেশি মাইনে দিতে রাজি হয়েছিলেন এ কারণে যে, টাকা দিয়ে তিনি ধারাল কলমগুলো কিনে নিতে পারবেন। দেশের মানুষের আস্থা ছিল যাঁদের সাংবাদিক সততায়, যাঁরা লেখক এবং কবি হিসেবে, বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তাঁরাই কিনা হয়ে গেলেন আইয়ুব খানের মিলিটারি গেজেটের কেরানি। সেদিন অধিক পয়সার লোভে যাঁরা আইয়ুব খানের দালালি করেছিলেন, আইয়ুব খানের আইয়ুবনামা অনুবাদ করেছিলেন, তাঁরা আজ কি করে, কিসের বলে স্বাধীন বাংলাদেশের রাতারাতি মস্ত দেশপ্রেমিকে পরিণত হলেন ভাববার বিষয়। একটা কথা বললে শত্রুতার মত শোনাবে— কিন্তু আসলে সত্যি। প্রেস ট্রাস্টের একটি বাংলা পত্রিকা জটিল এবং সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক সততার যে

ক্ষতি করেছে, তার জুড়ি নেই। প্রেস ট্রাস্টের অপর পত্রিকাটিও ক্ষতি করেছে। কিন্তু ইংরেজি হওয়ায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অল্প সুযোগই পেয়েছে সে তুলনায়। বাংলা পত্রিকাটিতে অধিক মাইনের লোভে এমন কতিপয় লোক আইয়ুব রাজত্বের শুরুর দিকে আত্মবিক্রয় করলেন, যাঁরা সুন্দর বাংলা লিখতে পারেন, সাংবাদিকতায় যাঁদের হাত পেকেছে, কবি-গল্পকার-প্রাবন্ধিক এবং বামপন্থী রাজনীতি-ঘেঁষা বলে যাঁরা আগেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তরুণ অনতিপ্রবীণ, প্রবীণ সকলে আইয়ুব খানের সামরিক গেজেটে যোগ দিয়ে একনায়কের জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। তার ফল হল, তরুণ এবং কিশোরেরা কোন রকমের সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হলেন। পত্রিকায় যে আকর্ষণীয় সাহিত্য বিভাগ চালু করা হয়েছিল আসলে ওটা ছিল সাহিত্যের কসাইখানা। কারণ সাহিত্যে জাতীয় অভাব অভিযোগের কথা সামাজিক দুর্নীতির কথা আসা চাই। কিন্তু দৈনিক পত্রিকাটি একটা পর্যায়ে বক্তব্যহীন কিন্তু রঙচঙে রচনাই ছাপতেন। দেশের অভাব অভিযোগের দিক থেকে তরুণদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার জন্য এই মনোরম ফাঁদ পেতেছিলেন, তাতে করে ঐ পত্রিকার হোমরাচোমরা গোছের লোকেরা অপরাধ বোধ লাঘবের এক ধরনের আত্মতৃপ্তি বোধ করতেন।

আইয়ুব খানের উদ্ভাবিত পদ্ধতি সৎ সাংবাদিকতাকে আরো নানাদিক দিয়ে ব্যাহত করেছে। বিশেষ করে পত্রিকাটির নাম করলাম এ কারণে যে, পত্রিকাটিতে আমাদের দেশের বেশ ক'জন প্রতিভাবান মানুষ চাকরি নিয়েছিলেন। তাঁদের রচনা, রচনারীতি, চিন্তাধারা এবং প্রগতিশীল ভূমিকার প্রতি আমাদের দেশের জনগণ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রতিভা এবং যোগ্যতা দিয়ে খান সাহেবের দালালিই করেছিলেন। প্রতিভাহীন ব্যক্তির ক্ষতি করার ক্ষমতা অল্প। প্রতিভাবান ব্যক্তি বুদ্ধি খাটিয়ে ইচ্ছে করলে খৈ খাওয়ার জন্য ধানের গোলায় আগুন লাগাতে পারে। পত্রিকাটির বেলায়ও তেমনটি হয়েছে।

অন্যান্য সাংবাদিকদেরও আইয়ুব খান নানা পদ্ধতিতে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করেছেন। সাংবাদিকদের জন্য বাড়ি, জমি, গাড়ি এইসব কিছুর ব্যবস্থা আইয়ুব রাজত্বেই হয়েছে। সাংবাদিকদের বাড়ি হবে না, গাড়ি থাকবে না— তেমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বলতে চাইছি আইয়ুব রাজত্বে সাংবাদিকদের মধ্যে হঠাৎ এমন একটা গাড়িওয়ালা, বাড়িওয়ালা, পয়সাওয়ালা সাংবাদিক শ্রেণী গজিয়ে উঠল— যাদের এই আকস্মিক সমৃদ্ধির কারণে জনগণের দুর্দশা বেড়েছে। যে সমাজে জনগণের মাথাপিছু আয় এক পয়সা বাড়ে না— সে সমাজে যদি সাংবাদিকেরা রাতারাতি বড়লোক হয়ে ওঠেন, তাহলে কথাটা কি এই দাঁড়ায় না— তাঁরাও জনগণের ওপর শোষণের কাজে সাহায্য করে আসছেন। প্রেস ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত সাংবাদিকদের নয় শুধু অনেক সময় চৌকষ বিরোধীদলীয় পত্রিকার সাংবাদিকদেরও পয়সা দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে প্রতিবাদের ধার ভোঁতা করে দিয়েছিল। মোটকথা, আইয়ুব রাজত্বে মুষ্টিমেয় সাংবাদিকদের নিয়ে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী পুরোপুরি সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা আইয়ুব খানের দালালি করেছেন, সৎ সাংবাদিকতার ক্ষতি

করেছেন, প্রদেশের সংবাদপত্র শিল্পের প্রসারে পরোক্ষে বাধা দিয়েছেন এবং সংখ্যাধিক সাংবাদিকের মতামতের স্বাধীনতা এবং রুজি-রোজগারের স্বাধীনতায় ছলে-বলে-কলে-কৌশলে হস্তক্ষেপ করার কাজে সামরিক সরকারের সহায়তা করেছেন। কারণ, যেভাবেই হোক না কেন, যাঁরা অত্যাচারী সামরিক সরকারের সহায়তা করেছেন এবং তা করে টাকাকড়ির মালিক হয়েছেন, তাঁরা যে গণতন্ত্র এবং দেশের মানুষের ক্ষতি করেছেন, আর নতুন করে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। কেউ কেউ বলে থাকেন গোবেচারা শিক্ষকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। বেচারারা অবস্থার শিকার। চমৎকার যুক্তি। কিন্তু এই গোবেচারারাই পেছনে একটা শক্ত খুঁটি পেলে করতে পারেন না হেন কর্ম নেই। গত তেইশ বছরের একটা হিসেব কষে দেখানো যেতে পারে। শিক্ষকেরা স্কুল-কলেজ পাঠ্য টেক্সট বইতে কি পরিমাণ মিথ্যে লিখেছেন, প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি কিভাবে সাধন করেছেন, কিভাবে জাতীয় চেতনার ধারাকে বিপথগামী করেছেন; তা অল্পকথায় শেষ করার নয়। সব শিক্ষক সম্পর্কে বলছিনে, যাঁদের সম্পর্কে বলছি, তাঁদের কাছ থেকে জাতি সুষ্ঠ কৃষ্টি-কালচারভিত্তিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আশ্রয়ী শিক্ষা পদ্ধতি আশা করেছিল। কিন্তু তাঁরা তা করেননি এবং এই না করার জন্য লাভবান হয়েছেন।

আইয়ুব খান শিক্ষকদের মধ্যেও একটা শ্রেণী গড়ে তুলেছিলেন। এই বিশেষ শ্রেণীটিকে নানা উপায়ে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে একান্ত অনুগত রেখেছিলেন। আমাদের দেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক যেভাবে রাজার হালে থাকেন তার সঙ্গে আশেপাশের উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের শিক্ষকদের বাস্তব অবস্থার তুলনা করে দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যে দেশে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকেরা একবেলা খেতে পান না, বেরসকারি স্কুলের শিক্ষকেরা বেতন পান না, সে দেশে এক শ্রেণীর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিভাবে বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে পারেন? বাড়ি থাকাটা খারাপ নয়, কিন্তু যে টাকা দিয়ে ওসব করা হয়েছে, সে টাকা অর্জনের পদ্ধতিটাই সামগ্রিকভাবে শিক্ষক সমাজ এবং দেশের জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। সাধারণ অর্থে যাদের আমরা কলাবরেটর বলি এঁরা তা নন। এঁরা ভিন্নভাবে সামরিক সরকারের সহায়তা করেছেন। কলাবরেটর শিক্ষকদের সাক্ষাৎ প্লেগের সঙ্গে যদি তুলনা করা যায়, এই ধরনের শিক্ষকদের বলা উচিত ক্ষয়রোগ। এই রোগ দিনে দিনে একটু একটু করে জীবনীশক্তি ক্ষয় করে একদিন হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে বসে। এখনো এই শ্রেণীটির হাতেই শিক্ষার দায় পুরোপুরি ন্যস্ত রয়েছে।

কবি, সাহিত্যিক, লেখকেরা গর্ভিণী নারীর মত। তাঁরা জাতির গড়ে ওঠার, বেড়ে ওঠার বেঁচে থাকার ভ্রূণকণা অন্তর্লোকে ধারণ করে থাকেন। জাতীয় জীবনে যা ঘটে গেছে অতীতে, তাঁরা ভাবের আবেশে সামনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে ফেলেন— এই-ই হতে যাচ্ছে এবং এই-ই হবে। কিন্তু বাংলাদেশের তেমন কবি, সাহিত্যিক, তেমন উপন্যাস লিখিয়ে কিংবা গাল্পিক কি আছেন? নেই। আমাদের যে বর্তমান নামকরা কবি কিংবা সাহিত্যিক আছেন, তাঁদের বেশিরভাগের প্রতি মানুষ খুব

শ্রদ্ধেয় মনোভাব পোষণ করে না। বাংলাদেশের আজকের দিনে লেখকেরা কবিরা সামাজিক দিক দিয়ে বোধহয় সম্মানহীন জীব। তাঁরা পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যার যোগানদার, রেডিও টেলিভিশনের অঙ্গসজ্জা এবং বিকৃত রুচিহীন নীরস পাঠ্যপুস্তক প্রণেতার অধিক কিছু নন। লেখক-কবি একটা জাতির সংগ্রাম, সাধনা চিত্তসম্পদ আবেগে ধারণ করেন এবং চেতনায় লালন করেন। কিন্তু বাংলাদেশের লেখকদের ক্ষেত্রে তা সত্য হয়নি। বাংলাদেশের লেখকেরা সামাজিক দায়িত্ব পালন করেননি— তাই সমাজও লেখককে শ্রদ্ধা করে না। সমাজে লেখকদের কোন ইমেজ নেই বললেই চলে।

অথচ বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের পর পর দেশের জাগ্রতচিত্ত লেখক কবিদের প্রতি অত্যন্ত ভরসার দৃষ্টিতে তাকাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। গণতন্ত্রের অপঘাত মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে প্রক্রিয়াটি গোড়াতেই বন্ধ হয়ে যায়। এই সুযোগে পাকিস্তানিবাদী বুদ্ধিজীবীরাই সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলো অধিকার করে বসলেন। সরকারি আনুকূল্য পেয়ে তাঁরা দেশের সংস্কৃতিকে বয় বেয়ারার মত ইঙ্গিতে যে দিকে ইচ্ছে চালাতে লাগলেন। বাহান্ন সালের রক্ত থেকে যাদের জন্ম, সে সকল তরুণেরাও এসে সুযোগ-সুবিধার জন্য এই পাকিস্তানিবাদী সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। মোটের ওপর লেখার ব্যাপারটিই সুযোগ দেয়া এবং সুযোগ গ্রহণ করার কাজ হয়ে দাঁড়াল। আইয়ুব খান এসে এই সমস্ত নতুন পুরনো লোকদের নিয়ে লেখক-সংঘ বানালেন।

লেখক সংঘ মানে লেখকেরা কি ভাববেন, কি চিন্তা করবেন, কি লিখবেন, কিভাবে লিখবেন জঙ্গীলাট নির্দিষ্ট করে দেবেন। তিনি যা বলবেন— এঁরা তা লিখবেন। বিনিময়ে লেখকদের দেয়া হল অঢেল সুযোগ-সুবিধা। তাঁদের জন্য আদমজী পুরস্কার, ঘন ঘন বিদেশ যাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেন। সেদিন বাংলাদেশে একজন লেখকও লেখকের সুস্থ এবং স্বাধীন মননশীলতার বিরোধী এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করেননি। বরং সকলে বগল বাজিয়ে আপনা থেকেই এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করেছেন খ্যাতনামা পশ্চিমা দালালদের কথা বলে লাভ নেই। যাঁরা কমিউনিস্ট, সর্বহারার আন্দোলনে বিশ্বাসী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁদেরও অনেককে দেখা গেছে ধনপতিদের হাত থেকে অর্থ পুরস্কার গ্রহণ করতে পেরে জীবন ধন্য মনে করেছেন। চিহ্নিত প্রতিক্রিয়াশীলরা তো প্রতিক্রিয়াশীল-সরকারের সহযোগিতা করত সেটা জানা কথা। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিশীল এবং কমিউনিস্টদেরও দেখা গেছে কার্যত জঙ্গীলাটের সহায়তা করতে। আদমজী পুরস্কার, দাউদ পুরস্কার, ন্যাশনাল ব্যাংক এবং হাবীব ব্যাংক পুরস্কার যাঁরা গ্রহণ করেছেন, সে তালিকাটা আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। তাতে এমন ক'জন মানুষের নাম রয়েছে, যাঁদেরকে এক শ্রেণীর মানুষ দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। আজকের বাংলাদেশের যে সকল খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক আছেন, তাঁদের বেশিরভাগই একভাবে না একভাবে সামরিক সরকারের সহযোগিতা করেছেন। এঁদের সকলে কি আইয়ুব খানের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেননি? শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এঁদের

কেউ কেউ জীবনপাত করেছেন বলে শোনা যায়— আদমজী, দাউদের দেয়া পুরস্কার গ্রহণ করে কোন শ্রেণীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা তাঁরা কামনা করেছিলেন? তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে সৎ-লেখক ও সৎ-বুদ্ধিজীবী ছিলেন না বললেই চলে। মুখে সর্বহারার রাজনীতি কিন্তু কাজের বেলায় বাঙালি-সংস্কৃতিরও বিরোধিতা করেছেন অনেকে।

বিএনআর-কে দোষ দেয়া হয়ে থাকে— দোষ দেয়া হয় শুধু হাসান জামানকেই। কিন্তু বিএনআর-এ যাননি কোন লেখক? সকলেই টাকা নিয়েছেন—আবার জনগণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সকলেই বিএনআর-এর গোষ্ঠী উদ্ধার করছেন। চমৎকার রসিকতা। বাংলাদেশের সমস্ত নামকরা কবি-সাহিত্যিক যাঁরা সোনার বাংলা নামে কেঁদে-কুটে বড় বড় পদ দখল করে বসেছেন— তাঁদের শতকরা নিরানব্বই ভাগই যে অকাণ্ড-কুকাণ্ড করেছেন তার ভুরি ভুরি প্রমাণ হাজির করা যায়।

লেখক সংঘ, বিএনআর রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে কতিপয় ব্যক্তি যে শুধু নষ্ট হয়েছে তা নয়— এসবের মাধ্যমে আইয়ুব খান একটি যুগের বিবেককে হত্যা করেছে, চিন্তাকে কলুষিত করেছে। তরুণ সমাজের সামনে শ্রদ্ধা করার মত কোন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিল না— এখনো নেই। কাউকে শ্রদ্ধা করতে না পারা যে কত বড় অভিশাপ একমাত্র ভুক্তভোগীই উপলব্ধি করতে পারেন। রেডিও, টেলিভিশন, লেখক সংঘ, প্রেস ট্রাস্ট ইত্যাদি আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান হলেও এসবের মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল।

আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা আমাদের সমাজের সবচেয়ে নোংড়া মানুষ। তাঁরা দেশকে যে হারে ফাঁকি দিয়েছেন কোন কালোবাজারির সঙ্গে তার তুলনা হয় না। তাঁদের ছদ্ম আদর্শবাদিতার সঙ্গে গণিকাদের সতীপনার তুলনা করা যায়। কে না জানে পাকিস্তান-ভারত যে যুদ্ধ হয়েছিল তা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ! সেই যুদ্ধে অনেকটা আসোয়ান ড্যামের টাকা খরচ হয়েছিল বলা হয়ে থাকে। এই আসোয়ান ড্যাম ভাল করে তৈরি করার টাকা ঋণ না পেয়ে প্রেসিডেন্ট নাসের রাতারাতি মার্কিন ব্লক থেকে সোভিয়েত ব্লকে চলে গিয়েছিলেন। এমনি একটা যুদ্ধকে নিন্দা করার মত একজন কবি, একজন লেখক ছিলেন না। অথচ পশ্চিম-বঙ্গে এই যুদ্ধের প্রতি সমর্থন দেননি বলে প্রায় আশিজন বুদ্ধিজীবীকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। আমাদের কবিরা, আমাদের লেখকেরা কি করেছেন? ভারতকে বাক্যবাণে হারিয়ে দেওয়ার জন্য কষে হিন্দু-নিন্দা করেছেন। খুবই বুক ফুলিয়ে গদগদ ভাষায় বলেছেন, দুনিয়াতে মুসলমানেরাই আসল জাতি! ভাগ্যের কি পরিহাস, সে কবি-সাহিত্যিকেরা এখন ভারতীয় পণ্ডিতদের সার্টিফিকেট এনে বাংলাদেশে আসন পোক্ত করার জন্য কোলকাতা ছুট দেন। আগে যে বইগুলো লিখেছেন কোনরকমে গুম করে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থেকে শুরু করেছেন— এবার অসাম্প্রদায়িকতার কেতাব লিখবেন।

বুঝতে কষ্ট হয় না আমাদের লেখকেরা কেন কল্পনা করতে পারেননি, কেন স্বপ্ন দেখতে পারেননি যে, বাংলাদেশ দু'এক বছরে স্বাধীন হবে। কল্পনা করা এবং স্বপ্ন দেখা তো আসল মস্তিষ্কের কাজ। আমাদের তাঁরা বাস্তব কাজে ব্যস্ত ছিলেন—সেটি

টাকা রোজগারের কাজ, তাও বাংলাদেশকে বেচে দিয়ে। ভুল হয়ে গেছে। সুতরাং পত্র পাঠ ক্ষমা করে দিন। অসাম্প্রদায়িকতার জয়গান গেয়ে আরো দুয়েক দাঁও মারতে দিন। ধন্য বাংলাদেশের লেখক।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের গণমুক্তি সংগ্রামে কি আবদান রেখেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে যে সকল কবি-সাহিত্যিক কোলকাতা গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে মুক্তি-সংগ্রামী হিসেবে সকলের সামনে পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁদের সেখানকার কাজ-কর্মের ধারা সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা কোলকাতা তথা পশ্চিম-বঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের বুদ্ধিজীবীদের সামনে যে পরিচয় রেখে এসেছেন তা আমাদের জাতির চূড়ান্ত লজ্জা এবং কলঙ্কের বিষয়। সকলের সম্পর্কে বলছিনে। বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীই কে কার চাইতে লোভী, এবং গবেট তা প্রমাণ করার জন্যে রীতিমত প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন।

জাতির এতবড় সংকটের মুহূর্তে কোলকাতা প্রবাসী কবি-সাহিত্যিকেরা আমাদের শরণার্থী জনগণের সঙ্গে কোনরকমের একাত্ম বোধ করার তাগিদ আদৌ অনুভব করেননি। তাদের বেশিরভাগের বক্তৃতায়, কথায়, লেখায় জনগণের সঙ্গে এক সারিতে নেমে আসার আবেগ বিকিরিত হয়নি। এই বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের দখলদার বাংলাদেশে থাকলে বেয়নেটের গুঁতোর চোটে এবং লোভের বশবর্তী হয়ে যেভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করতেন, একইভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন করেছেন। ঘটনাচক্রে তাঁদের কোলকাতা যেয়ে কয়েক মাস উদ্বেগে কাটাতে হয়েছিল— মুক্তি-সংগ্রামী বলে পরিচয় দেয়ার তাৎপর্য এটুকুই— বেশি কিছু নয়।

এই সময়ে বাংলাদেশের জনগণ যাঁরা পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে চৌদ্দ পুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে, নিহত আত্মীয়-পরিজনের স্মৃতি বুকে নিয়ে, সর্বহারা অবস্থায় ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং পশ্চিম-বাংলার নগর জনপদে জীবন্ত প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল— ভারতীয় এবং বিদেশি সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক আর বিশ্বের মানববাদী মানুষ যাঁদের প্রাণ রক্ষা করার জন্যে পথে নেমে এসেছিলেন, বাংলাদেশের লেখক-সাহিত্যিক কি তাঁদের এই দুর্গত অবস্থার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে একটি কথাও বলতে পেরেছেন? দেখে-শুনে আমাদের ধারণা হয়েছিল, বাংলাদেশের লেখক-সাহিত্যিকদের হৃদপিণ্ডগুলো প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। সেই সময়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের যে অসহনীয় অবস্থা তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। প্রতিদিন সীমান্ত পেরিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে হাজার হাজার স্বাধীনতা প্রেমিক কিশোর, যুবক এসে সমবেত হচ্ছেন। কিন্তু শিবিরে অত লোককে স্থান দেবার ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে তরুণেরা, যাঁদের বেশিরভাগই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র, গাছতলায় রাত কাটাচ্ছেন, রোদে পুড়ছেন এবং বৃষ্টিতে ভিজছেন। কারো কারো অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। শরণার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থার সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের তুলনা করা যাক। বুদ্ধিজীবীরা তখন কি করছেন? দিল্লি-হিল্লি ঘুরে

বেড়াচ্ছেন, বাংলাদেশের গণহত্যার নাটকীয় বর্ণনা দিয়ে নিজেদের রুটি রুজির ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করে নিচ্ছেন, বিদেশ থেকে আসা সাহায্যের অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করছেন। শিক্ষক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক এবং উকিল-মোক্তার যাঁরাই গিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশ এইভাবেই কোলকাতা থেকে মুক্তি-সংগ্রাম করেছেন।

আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একটি বিশেষ মানসিকতা দেখে পশ্চিম-বাংলার লোকেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। বিদেশ থেকে যে সাহায্য এসেছে তাও উদরসাৎ করেছেন তাঁরাই। অথচ সাহায্যের যাঁদের দরকার সবচাইতে বেশি তাঁরাই বঞ্চিত হয়েছেন। কোলকাতা শহরেও বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। বিদেশ থেকে শিক্ষকদের দেয়ার জন্য টাকা-পয়সা সাহায্য এসেছে, সে সাহায্য পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের কতিপয় শিক্ষক। প্রাইমারি স্কুল এবং কলেজের শিক্ষকদের কাছে সে সাহায্য পৌছায়নি বললেই চলে। ঢেঁকি যে মক্কা গেলেও ধান ভানে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের দেখে আমাদের সে ধারণা অধিকতর সুদৃঢ় হয়েছে। কোলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলোতে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, পড়লে যে কোন স্বাধীনতাকামী আত্মবিশ্বাসী মানুষের মাথা আপনা থেকেই হেঁট হয়ে আসার কথা। আসল পরিসংখ্যান রিপোর্ট আগে প্রকাশিত হয়নি। তবু বলতে হয়, আনুমানিক তিরিশ লাখের মৃত্যু, প্রায় এক কোটি মানুষের দেশ ত্যাগ এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ছ' কোটির মত মানুষের বন্দিদশা দেখে বুদ্ধিজীবীরা কোনরকম বিচলিত হয়েছিলেন বলে একটুও মনে হয় না। যদি তাই হত তাহলে কি করে বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা কোলকাতার কাগজে মনগড়া কাহিনী রচনা করেন? কি করে লেখকেরা সভা-সমিতিতে এন্তার মিথ্যা কথার তুবড়ি ছোটান— তাও আবার এমন মিথ্যা যার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের সামান্যতম সংযোগও নেই।

বাংলাদেশের অনেক সাহিত্যিক-সাংবাদিক মুখে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু করেছেন উল্টো। সকলের সম্পর্কে আমরা বলছিনে। কোলকাতাতে যেয়ে যাঁরা সুযোগ লুট এবং টাকা ভাগাভাগি করার চক্র-উপচক্র সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের কথাই বলছি এবং তাঁদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ। একশ্রেণীর শিক্ষক এবং সাহিত্যিক ভারতে যেয়ে আমেরিকার টাকায় আরামে দিন কাটিয়েছেন। অথচ সে সময়ে মার্কিন অস্ত্রে এ দেশের মানুষকে পাকিস্তানি সৈন্যরা পশুর মত হত্যা করছে। তাঁরা কি করে এই সময়ে মার্কিন অর্থ গ্রহণ করতে পারলেন, তার রহস্য এখনো অজানা থেকে গেছে। যদি এমন হয় যে, মানবতার খাতিরে মার্কিনীরা এ টাকা দিয়েছিল, তাহলে সে টাকা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষকেরা পেলেন না কেন? কয়েকজন ভাগ্যবান শিক্ষক, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক মিলে সে টাকা আত্মসাৎ করলেন কেন? বিপদ তো সকলের জন্যেই। তাই যদি হয়, অন্যান্য শিক্ষক এবং সাংবাদিকেরা বাদ পড়ে গেলেন কি করে? কোন কোন শিক্ষক, সাংবাদিক তো প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরোধিতা করেছেন।

বাংলাদেশের কিছু কিছু অধ্যাপক এবং সাহিত্যিকের কথা জানি যারা কোলকাতা গিয়ে রাতারাতি ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্য তাঁদের কোলকাতায় যেয়ে খুন করবে সেরকম কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবু তারা ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। এর প্রয়োজনটা ছিল কি? প্রয়োজন ছিল বৈকি। তা দু'ধরনের। এক, তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না যে বাংলাদেশ সত্যি স্বাধীন হবে। যদি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান টিকেই যায়, আর তাঁদের যদি দেশে ফিরে আসতে হয়, বলতে পারবেন তাঁরা পাকিস্তান সরকারের বিপক্ষে কিছু করেননি। দুই নম্বর হল, ছদ্মনামে সত্যি-মিথ্যে গল্প ফেঁদে ভারতীয় জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করার যে সুযোগ পেয়েছিলেন, তার সদ্ব্যবহার। যেহেতু ছদ্মনামে লিখেছেন তাই দেশের কেউ তাঁদের কোন কার্যকলাপের প্রতি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। যারা এরকম দুর্বলচিত্তের এবং যুদ্ধের সময়ে এই দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়েছেন, স্বাধীন বাংলাদেশে এসে মুক্তি-সংগ্রামী হিসেবে কিভাবে দাপট দেখান এবং সরকার কোন যুক্তিতে তাঁদের টেনে তুলে উঁচু পদে বসালেন? এ ধরনের অপকর্ম শুধু লেখক-সাহিত্যিক-সাংবাদিকরা করেছেন এবং অন্যরা একেবারে খাঁটি ছিলেন সে কথা কিছুতেই সত্যি নয়। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত লোকেরা যা করেছেন ঠিকমত প্রকাশ পেলে লোম দাঁড়িয়ে যাবে, তা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মনন-রীতি এবং চিন্তন-পদ্ধতির মধ্যে, আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় একটা বিরাট গুণগত পরিবর্তন খুবই প্রত্যাশিত ছিল। সমগ্র বাঙালি জাতির লিখিত ইতিহাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মত তাৎপর্যবহ কোন ঘটনা নেই। এই-ই প্রথম বাঙালি জাতি একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। সে রাষ্ট্রের আঙ্গিক এবং প্রকরণ যা-ই হোক না কেন, বাংলার ঐতিহাসিক অহং-এর এই অভ্যুদয় যে সম্পূর্ণ অভিনব ঘটনা, তার গুরুত্ব কিছুতেই ছোট করে দেখার উপায় নেই। একটি নবীন রাষ্ট্রসত্তা হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি চিহ্ন তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষকদের, সাংবাদিকদের, কবি-সাহিত্যিকদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরা সে দাবি মিটাতে পারছেন না।

আমাদের রেডিও-টেলিভিশনে যাঁদের চেহারা দেখি, কণ্ঠস্বর শুনি, আমাদের কাগজগুলোতে, সাময়িকীর পৃষ্ঠায় যেসব রচনা প্রকাশিত হয়, দেখে মনে হয়, কোনরকমে মুখরক্ষা করতে পারলেই যেন সকলে বেঁচে যান। যে নতুন কাল সামনে এসেছে, সেকালের অন্তর্বাণী কি তা উপলব্ধি করে জনসাধারণের সামনে এঁরা যথাযথভাবে উপস্থিত করতে পারছেন না। তাঁদের কুঁকড়ে যাওয়া মানসিক প্রত্যঙ্গগুলো নবযুগের আহবানে সাড়া দিতে পারছে না। তাই তাঁরা জোরে চিৎকার করছেন এবং চিৎকারের অন্তরালে তাঁদের চিন্তাশূন্যতা এবং মানসিক বন্ধ্যাত্ব ঢেকে রাখার অন্তহীন কসরত করে যাচ্ছেন। এই ভদ্রলোকদের, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ভালগার' তা ছাড়া কিছু মনে করার উপায় নেই। কাগজগুলো খুললেই দেখা যাবে

লেখক-কবিরা সকলে পরামর্শ করে কলস কলস অশ্রু বিসর্জন করছেন, যেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে লম্বা টানে বিলাপ করাটাই সবচেয়ে করণীয় কাজ। বিলাপ একটি জীবন্ত সম্ভাবনাময় জাতির সবচাইতে বড় শত্রু। কারণ, যে জীবন্ত, তার অতীতের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে খেদ করার খুব একটা বেশি সময় নেই। অতীতের চাইতে তার কাছে ভবিষ্যৎটাই মুখ্য। আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের হালফিল প্রকাশিত রচনায় ভবিষ্যতের ইশারাটি কোথায়? কাগজগুলোতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কিত যে সকল রচনা প্রকাশিত হচ্ছে তাতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মুখ্য বৈশিষ্ট্যটি ফুটিয়ে তোলার বদলে স্থূলতাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে রং চড়িয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে। এই ধরনের রচনার সার্থকতা কোথায়? রেডিও, টেলিভিশনে প্রতিদিন নয়া শিক্ষা, নয়া সংস্কৃতির নামে যে সকল ভদ্রলোক তারস্বরে চিৎকার করে রুচি পীড়িত করেছেন, তার দরকারটাই বা কি? সভা-সমিতিতে প্রতি মাসে যে সকল পণ্ডিত মাথা চুলকে চতুঃস্তম্ভের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছেন এবং জাতিকে, তরুণ সমাজকে হেদায়াত করে যাচ্ছেন, তাঁদের কথা শুনে কারই বা মনে ভাবান্তর আসে? কেইবা এই আত্মরতিপরায়ণ পণ্ডিতদের কথায় বিশ্বাস করে? না করাটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা এক বছর আগেও এই সকল ভদ্রলোক প্রকাশ্যে গণ-সংগ্রামের বিরোধিতা করেছেন। এই লেখক-কবিদের বেশিরভাগই সংহতির নামে গদগদ হয়ে যেতেন। আরসিডি ট্যুর ইত্যাদির সুযোগ গ্রহণ করার জন্য দরকার হলে পশ্চিমা হুজুরদের জুতো পালিশ করে দিতেন। তারাই আবার প্রকাশ্যে মাঠে নেমে চিৎকার করে বলছেন, পাকিস্তানি দস্যুরা নিপাত যাক, তারা আমাদের তিরিশ লাখ নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে, মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে ইত্যাদি। সেই যে ষোলই ডিসেম্বরের পর থেকে বলতে শুরু করেছেন এখনো সমানে বলেই চলেছেন। আমাদের মহারথীদের একটিই বৈশিষ্ট্য, তাঁরা যা করেন, প্রকাশ্যেই করেন। পাকিস্তানিরা তো নিপাত গেছে, তিরিশ লাখ মানুষ তো মেরেই ফেলেছে এবং আপনারা বেঁচে যখন আছেন, সে মরা মানুষের নামে মরাকান্না কেঁদে কি আর লাভ? যারা বেঁচে আছে তাঁদের কথাটি একবার ভেবে দেখুন দেখি। মরলে তো সকল সমস্যা চুকে-বুকে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকার হাজার লেঠা। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের এই জীবিত মানুষদের সম্বন্ধে কোনও ভাবনা-চিন্তা করতে রাজি নন। কেননা তা করলে ঘাড়ে অনেক দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে, অনেক ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। চাই কি কর্তৃপক্ষের শত্রুও হতে হবে। সুতরাং কার বা গোয়াল কে দেয় ধোঁয়া। এতে করে হচ্ছে কি? কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি বাংলাদেশে শুধু নিজেদের অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখছেন না— একই সঙ্গে নতুন চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং বুদ্ধিবৃত্তির নতুন প্রকরণেরও বিরোধিতা করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জনযুদ্ধের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক আদর্শের বদলে আরেকটি রাজনৈতিক আদর্শ, এক ধরনের রাষ্ট্রের পরিবর্তে আরেক ধরনের রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রভাব আমাদের সংস্কৃতিতে আসতে বাধ্য। পাকিস্তানি সংস্কৃতির স্থলে নতুন প্রাণবন্ত এবং সৃজনশীল বাঙালি সংস্কৃতির মহীরুহে শত শত নতুন মুকুল মেলবে। এটা প্রত্যাশা করা একটুও অস্বাভাবিক নয়। যদি তা

বাস্তবে পরিণত না হয়, তাহলে আমরা কোনদিন মনে-প্রাণে স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা তুলতে পারব না। একটি যুদ্ধোত্তর সমাজের নানা অসুবিধা, অপূর্ণতা, উত্তেজনা এবং ভুল বুঝাবুঝির মধ্যেও নতুন সংস্কৃতির বুনিয়াদটি ভেতর থেকে সৃজিত হচ্ছে কিনা তার প্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, আমাদের যাঁরা সুধীজন বলে কথিত, তাঁদের চিন্তা স্বপ্নের যে ছায়াপাত—লেখায়, গল্পে, বক্তৃতায় দেখতে পাচ্ছি, তাতে নতুন সমাজের অঙ্কুরটি নেই। আমাদের প্রবীণ এবং অনতিপ্রবীণেরা একেবারে বেমালুম ফেল মেরে যাচ্ছেন। আমাদের সমাজের যে নতুনতর মানব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, যে নতুনতর মূল্যবোধের অঙ্কুরণ করার কথা এবং দৃষ্টিতে নতুন ভঙ্গি আসার কথা, তার লক্ষণগুলো ক্রমশ সুদূরে বিলীয়মান হচ্ছে। চারদিকে চিন্তাশূন্যতার নৈরাজ্য এবং চাটুকারিতার চক-চকানি। এরই মধ্যে আমাদের সৃজনশীলতা রেশমের ফাঁসে আটকা পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী, সরকারি পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন এসব আবার প্রতিক্রিয়ার দুর্গ হয়ে উঠেছে এবং এই চক্র দিনে দিনে শক্তিশালী হচ্ছে। এর মধ্যে পড়ে তরুণদের কল্পনা, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা প্রতিদিন কলুষিত হচ্ছে।

পাকিস্তান আমলে বুদ্ধিজীবীদের যে একটি সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল, তা এখন ভেঙে গেছে। যে সমাজব্যবস্থায় এক ধরনের রবার স্ট্যাম্প মার্কা বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি, যাতে বুদ্ধিজীবীরা কি ভাববেন, কি বলবেন, কি লিখবেন, উপর থেকে বলে দেয়া হত, পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে সকল বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে খাঁচার টিয়ে বাইরের উন্মুক্ত আকাশে এলে যেমন হয় সেরকম। বর্তমান মুহূর্তে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরাই হচ্ছেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শ্রেণী। এঁরা চিরদিন হুকুম তামিল করতেই অভ্যস্ত। প্রবৃত্তিগত কারণে তাঁরা ফ্যাসিস্ট সরকারকেই কামনা করবেন। কেননা একমাত্র ফ্যাসিস্ট সরকারই কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী সম্মান শিরোপা দিয়ে পুষে থাকে। অল্পসংখ্যক বাছাই করা লোককে দিয়ে নিজেদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডা করিয়ে গোটা দেশের জনসমাজের স্বাধীন চিন্তা এবং প্রাণস্পন্দন রুদ্ধ করেই ফ্যাসিবাদ সমাজে শক্ত হয়ে বসে। চিন্তাশূন্যতা এবং কল্পনাশূন্য আস্ফালনই হল ফ্যাসিবাদের চারিত্র্য লক্ষণ।

আমাদের সমাজ এখন একটি দোলাচলের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। জনগণ সত্যি সত্যি গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করতে পারে এবং সমাজের প্রাচীন সম্পদ সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে সমাজে অধিকাংশের কল্যাণমুখী শোষণহীন নয়া ধন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আবার একটি বিশেষ শ্রেণী গালভরা চটকদার শ্লোগানে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতায় গ্যাঁট হয়ে বসে পাকিস্তানি একনায়কদের অনুকরণে চিন্তার স্বাধীনতা, জীবিকার স্বাধীনতা, কল্পনার স্বাধীনতা, এককথায় দেশের নামে, জাতির নামে সমস্ত মানবিক স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে। ঘটনাচক্রে বাংলাদেশেও যদি তেমন ঘটে যায়, খুব বেশি অবাক বা বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এই ধরনের পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি আমলের

বুদ্ধিজীবীরা এই ফ্যাসিবাদেরই সহায়তা করবেন। তার কিছু কিছু লক্ষণ এরই মধ্যে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। গোটা দেশের জনসমষ্টির প্রায় সিকি-শতাব্দীর সংগ্রামে এঁদের কোন অবদান নেই। এঁরা পাকিস্তানিদেরই সহায়তা করেছেন এবং পাকিস্তানি কর্তারা চিন্তা-ভাবনার যে মূল্যমান স্থির করে দিয়েছিলেন, তাকেই চরম এবং পরম জ্ঞান করেছেন। যে-কোন কারণেই হোক, পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করলেও তাঁদের দাস্য মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি। আবার এই দেশে যখন ফ্যাসিবাদ শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তাঁরাই আবার ফ্যাসিবাদের ঘোর সমর্থক হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য ইতিহাস এক সময় প্রমাণ করবে পাকিস্তানি আমলের বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এবং তাদের শিষ্য-সাগরেদরাই হলেন বাঙালি জাতি, বাঙালি সংস্কৃতির শত্রু।

বর্তমান সরকার গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করেছেন। এসবকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য যে সকল মানুষ ভাড়া করে এনেছেন এবং তাঁদের অতীত জীবনের রচনা পাঠ করে বলে দেয়া যায়, এঁদের বুদ্ধি একনায়কের সেবা ছাড়া আর কোন কিছুতেই খেলে না। সাম্প্রদায়িক মানুষকে দিয়ে অসাম্প্রদায়িকতা প্রচার এবং চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে আদিম স্থূল মানুষদের দিয়ে প্রাগ্রসর সমাজদর্শন সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচারের ব্যাপারটা রেলগাড়িতে গরুর গাড়ির চাকা লাগানোর মত হাস্যকর প্রয়াসের মত কি কেমন বিদঘুটে ঠেকে না? বর্তমান নেতৃত্বের একটি বিরাট দুর্বলতা হল, তাঁরা যে সকল রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন, কাজে খাটানোর মত কোন সাংস্কৃতিক এলিট সৃষ্টি করতে পারেননি। সেজন্য পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের ভাড়া করে আনতে হচ্ছে। আর পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীরা সরকারি যন্ত্রের হাল ধরেই নিজেদের পূর্ব-সংস্কার এবং অভ্যাস অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় যন্ত্র চালনা করবেন। সম্প্রতি সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে তার লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নয়া শিক্ষানীতির রূপরেখা নির্ধারণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষকেরা উঁচু পদে চড়বার জন্য কর্তার তোষামোদ এমনকি ছাত্রদেরকেও ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছেন। পত্রিকাগুলো সেই পাকিস্তান আমলের মত নোংড়া প্রচারপত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বেতার এবং টেলিভিশন স্থূল রুচিহীন লোকদের আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃজনের তাগিদ, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রগতিশীল চাহিদা কোনো দাম পাচ্ছে না। কর্তার তোষামোদ, ধরতাই বুলি কপচানো, দলাদলি, অবদমিত সাম্প্রদায়িকতা, পদের মোহ এসব প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

আগের মত দেশ এবং দেশের মানুষের চালাবার দায়িত্ব আল্লাহর কাঁধে ছেড়ে দিয়ে এরা নিরাপদ নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করছেন। অবস্থা যদি এরকমভাবে চলতে থাকে তাহলে দেশে ফ্যাসিবাদ শক্ত হয়ে বসবে তা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

সরকার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলছেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন কিন্তু কিভাবে? শিক্ষা এবং সংস্কৃতি তো সমাজ সৃজনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সেই শিক্ষা এবং সংস্কৃতির

রূপায়ণের জন্য যে সকল মানুষ আমদানি করছেন, তাঁদের বেশিরভাগই তো আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানের প্রিয় অফিসার। এঁদের দিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সৃজন— কামারকে দিয়ে সোনার গয়না গড়ানোর মতই অবাস্তব। এ ধরনের মানুষ দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে সরকার কি শিব গড়তে বানর গড়বেন না? সরকার তো সব নয়। জনগণ না চাইলে এই সরকার নয়, কোন সরকারই তো টিকতে পারে না। দেশের মানুষই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করবে— এই শেষ কথা। দেশের মানুষের হয়ে যারা ভাববেন, কাজ করবেন, তাঁদের চিন্তা পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত?

বাংলাদেশে এখন একটি রেনেসাঁর সময়। কিন্তু নানামুখী ঘটনা এবং সামাজিক শক্তিগুলোর ঘাত-প্রতিঘাতে একটি জাতির শিল্প-সংস্কৃতিতে নতুনতর অধ্যায় সংযোজন এবং বিজ্ঞানে দীক্ষা গ্রহণ নানাকারণে বিলম্বিত হতে পারে। কেননা পাকা বীজও পাথরে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তবু একটি রেনেসাঁ যে আসন্ন এ দেশে তার সম্ভাবনাগুলো কি কি সংক্ষেপে আলোচনা করা মোটেই অসম্ভব নয়। একটি সমাজ যখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, তার প্রতিষ্ঠিত বিচার-আচার, সংস্কার-বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আইন-কানুন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তব জীবনের চাহিদা মেটাতে মোটেই সক্ষম হচ্ছে না, তখন সেই বিশেষ সমাজের বেঁচে থাকার তাগিদে জীবনকে সমৃদ্ধ এবং গরীয়ান করার প্রেরণায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে নয়া, দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিচার করতে হয়। নতুন চিন্তার অস্ত্রে সজ্জিত নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করে। তারা পুরনো সমাজের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙেচুরে নতুন যুগের প্রয়োজন মত নতুনভাবে ঢালাই করে। তখন সমাজে মানুষের সম্পর্কের ধরনটা একেবারেই বদলে যায়।

মধ্যযুগের ইউরোপে এমনটি ঘটেছে। কতিপয় মানুষ যখন উপলব্ধি করলেন, যাজকেরা যা বলেন অর্থাৎ রাজা আল্লাহ্‌র ছায়া, নারী নরকের দ্বার, মানুষের রক্ত-মাংসের দাবি শয়তানের প্ররোচনা, মনের প্রশ্নশীলতা নয়, বাইবেলের বাণীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যই সৎ জীবনযাপনের প্রকৃষ্ট উপায়; এসবের পেছনে কোন বাস্তব সত্যের সমর্থন নেই, তখন থেকে তাঁরা মানবজীবনকে জাগতিক সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে চিন্তা করলেন, ছবি আঁকলেন, রাজনৈতিক সন্দর্ভ রচনা করলেন, কবিতা লিখলেন। দ্যা ভিঞ্চির ছবি, শেক্সপিয়ারের কাব্য, বেকনের দর্শন, হবস, লক প্রমুখের রাজনৈতিক সন্দর্ভ মূলত অর্গলবদ্ধ মানব চিন্তা-চেতনার নানামুখী বহিঃপ্রকাশ। ইউরোপীয় মানসের এই বন্ধনমুক্তি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার ফলিত রূপ মহান ফরাসি-বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবের ফলে রাজা বিতাড়িত হল, মানুষে মানুষে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব অন্তত তত্ত্বগতভাবে হলেও স্বীকৃত হল। ইউরোপীয় চিন্তের নবতর সৃজনশীলতা বস্তুবীক্ষা এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরো একটি বিপ্লবের সূচনা করে। সেটি ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে প্রাচীন পৃথিবীর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। শিল্প-বিপ্লব, ফরাসি-বিপ্লব এবং পরবর্তীকালের রুশ-বিপ্লব ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রত্যক্ষ এবং দূরবর্তী ফসল।

বলা হয়ে থাকে উনবিংশ শতাব্দীর তৎকালীন বাংলাদেশেও একটা রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়েছিল। প্রতিটি রেনেসাঁর একটি সামাজিক পশ্চাদভূমি থাকে। সমাজের একটি শ্রেণী আপনা থেকে উদ্যোগী হয়েই রেনেসাঁর বীজধারণ করে, বহন করে এবং লালন করে। সে শ্রেণীটি মানবচেতনার নতুন দিক-নির্দেশ করতে প্রয়াসী হয় এ কারণে যে, তার মধ্য দিয়েই সে বিশেষ শ্রেণীটির জাগতিক আকাঙ্ক্ষা স্ফূর্তি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর তৎকালীন বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের ফলে লাভবান হয়েছিল যে শ্রেণীটি, তার বিত্ত, বৈভব এবং সামাজিক মান-মর্যাদা সবই বিদেশি রাজত্বের কারণে এবং এই শ্রেণীটিই ইউরোপীয় রেনেসাঁর মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। তারাই নতুন মানবধর্ম প্রচার করল। নতুন সাহিত্য রচনায় ব্রতী হল এবং নতুনভাবে সমাজকে ঢালাই করতে উদ্যোগী হল। তাঁদের প্রচেষ্টা পুরোপুরি ফলবতী হয়নি। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'লৌহ কাঠামো' মেনে নিয়েই তাদেরকে চিন্তা করতে হয়েছে, কাজ করতে হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যে তাঁদের অনেকেই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন একথা সত্যি। কিন্তু সামাজিকভাবে তাদের প্রচারিত মতবাদ খুব বেশি প্রসার লাভ করেছে একথা জোর করে বলার উপায় নেই। ইউরোপের ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার আদর্শ সমাজের উঁচুবিত্তের গণ্ডি পেরিয়ে কৃচিৎ কখনো নিচুতলা স্পর্শ করতে পেরেছে। তাই দেখা যাবে, উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর প্রভাবে বাংলাদেশে কতিপয় বিশ্ববিশ্রুত মনীষার জন্ম হলেও তারা সমাজের সাধারণ মানুষকে খুব কমই প্রভাবিত করতে পেরেছেন। সেকালে সাম্রাজ্যরক্ষার খুঁটি হিসেবে যে শ্রেণীটি সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, যারা রক্ত-মাংসে নেটিভ এবং মর্জি মেজাজে ব্রিটিশ, সেই ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীর স্তর অতিক্রম করে সমাজের প্রাকৃতজনের কাজে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীবৃন্দের কোন প্রভাব পড়েনি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের মনে তাঁদের ভাবধারা সমানভাবে প্রেরণা জাগানোর কথা দূরে থাকুক, শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বমানুষকেও জ্ঞানের ভোজে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আহবান করতে পুরোপুরি ধর্ম বহির্ভূত হলেও তার চেহারাটি ধর্মীয় এবং আকারটি সাম্প্রদায়িক। সুতরাং বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁকে বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের নব জাগরণ বলা নানাদিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত। রামমোহন রায়ের শিষ্যদের মধ্যে কেউ নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলেন সত্যি সত্যি, সে রকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-বিস্তার এবং সমাজ-সংস্কার প্রয়াস তাঁর আপন গণ্ডির মধ্যেই সীমিত ছিল। শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য-বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে এ পর্যন্ত বর্ণ হিন্দুদের বাদ দিয়ে নিচুস্তর থেকে কোন উল্লেখ্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর এমনকি বিংশ শতাব্দীর শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের জগৎজোড়া খ্যাতি প্রতিপত্তি যেন সমুদ্র তরঙ্গের শীর্ষে ফরফরাসের মত। নিচের দিকে আলোকিত করার কোন ক্ষমতা নেই। রেনেসাঁর ভাব তরঙ্গের বেগ বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু অতীতের মোহ এখনো বাংলার ও অংশের মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অতীত এবং বর্তমানের দ্বন্দ্বে অতীত যদি মহীয়ান হয়

এবং বর্তমান যদি হয় সমস্যাসঙ্কুল, সহজ বিশ্বাসী মানুষেরা অতীতের ধ্যানেই দিন অতিবাহিত করে। ব্রিটিশ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজ প্রয়োজনে সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে, তাদের চিন্তন-পদ্ধতি, অভ্যাস, মনন ইত্যাদির ছাপ এখনো বাংলার মানুষের মনে রয়ে গেছে, একটুও রংছুট হয়নি। একটা সংগ্রাম করে যদি সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করতে পারতেন, অন্তত তেমন আশাও যদি থাকত, তাহলেও বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য থেকে অনুকরণ করবার মত, শ্রদ্ধা করার মত কিছু পেতাম। কিন্তু তা হবার নয়।

সূর্য পূর্ব দিকেই উদিত হয়। বাংলার এই পূর্ব অংশেই আর একটা রেনেসাঁ সম্ভাবিত হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় তার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা অনেক বেশি হওয়ার কথা। রেনেসাঁরও তো সামগ্রীর প্রয়োজন। তা বাংলাদেশে বেশ কিছুদিন থেকেই অধিক হারে সঞ্চিত হয়ে আসছে। আইডিয়ার সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গতি না থাকলে বিকাশ বিকলাঙ্গ হতে বাধ্য। উনিশ শতকে ব্রিটিশের দৌলতে ধনবান, প্রতিষ্ঠাবান এবং জ্ঞানবান একদল মানুষ চাইতেন সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার হোক, মানুষে মানুষে সহজ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু ব্রিটিশ তা চাইত না এবং তারা ছিলেন একভাবে না একভাবে ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাংলাদেশের সর্বমানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার এখন অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞান এবং যুক্তির আলোকে এ যাবৎকাল ধরে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সমাজের প্রাণহীন আচার সংস্কারগুলো কখনো বিচার করা হয়নি। এইবার সময় এসেছে। কামাল পাশার তুরস্কের মত বাংলাদেশেও অনেকগুলো মজ্জাগত ধর্মীয় সংস্কার জোর করে পিটিয়ে তাড়াতে হবে। শুধু হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাতৃত্ব নয়, গারো, হাজং, চাকমা, মগ যে সকল অধিবাসী আছেন, যে সকল উর্দুভাষী থেকে যাবেন তাঁদেরকে পুরোপুরি মানবিক মর্যাদা দিতে হবে। মানুষকে সত্যিকারভাবে মর্যাদা না দিয়ে মানুষের কোন শ্রদ্ধেয় সমাজ সৃজন সম্ভব নয়।

ব্রিটিশ সৃষ্ট হিন্দু-মধ্যবিত্ত বাবুকালচার অথবা আলীগড় প্রভাবিত মুসলিম মধ্যবিত্ত মানসিকতার কিংবা প্রতীচ্যের দুষ্ট প্রভাবে দূষিত মানসিকতায় আমাদের সময়ে যে নতুন মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত তা প্রতিফলিত হওয়ার কথা নয়। অথচ এই নতুন সমাজের, নতুন মানবিক সম্বন্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণই হচ্ছে বাংলাদেশে নতুন একটি বিজ্ঞাননিষ্ঠ মহীয়ান সংস্কৃতি সৃজনের গোড়ার দিকের কাজ। যাঁরা এখন সংস্কৃতির অভিভাবক তাঁদের দিয়ে এ হবে না। প্রথমত, তাঁরা ভয় পাবেন, দ্বিতীয়ত, বিরোধিতা করবেন। ভয় পাবেন এ কারণে যে, তাঁরা নতুন করে চিন্তন-পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে পারবেন না, তাই জাতির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন যদি অন্যকারো হাত দিয়ে আসে প্রাণপণে বিরোধিতা করবেন। যখন প্রয়োজন হবে ফ্যাসিবাদের সহায়তা করবেন। যারা বাংলাদেশে সর্ব মানবের জীবনের মঙ্গলের মত একটি প্রাণোচ্ছল সংস্কৃতি কামনা করেন, তাঁদের রাজনীতি এবং সংস্কৃতিকে পিঠেপিঠি ভাই-বোনের মত দেখা ছাড়া উপায় নেই। কেননা রাজনীতিতে যদি ফ্যাসিবাদ শিকড় গেড়ে বসে, সাংস্কৃতিক অগ্রসরণের প্রশ্নই ওঠে না। সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ছাড়া

কোন রাজনৈতিক অগ্রগতি নেই। রাজনীতি সুন্দরভাবে, সুস্থভাবে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করে বাঁচার সংগ্রাম।

এই যুদ্ধ আমাদের দেশের জীবনে সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। অন্যান্য দেশে যেমনটি হয়ে থাকে আমাদের দেশের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া শুরু থেকেই প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়নি। তার কারণ এই যুদ্ধের জন্য আমাদের জনগণের ঠিক মানসিক এবং সামরিক প্রস্তুতি ছিল না, যদিও জনগণ অবচেতনে অনুভব করছিলেন, একটি যুদ্ধ ছাড়া আমাদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান নেই। তার মানে একটি জনগোষ্ঠীর যুদ্ধ করে স্বাধীনতা আদায় করার জন্য যে ঐক্য এবং একাগ্রতা প্রয়োজন তা আমাদের জনগণ অর্জন করতে পেরেছিলেন। তা না হলে সুদীর্ঘ নয় মাসকাল সময় সংগ্রাম চালিয়ে বিজয় অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব হত না। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি মারাত্মক দুর্বল দিক হল, আমরা দেশের মাটিতে লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারিনি। আমাদেরকে বিদেশে আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং বিদেশি সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দেশ যেভাবে বিদেশি সাহায্য গ্রহণ করে তার সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের অনেকটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে। একথা স্মরণে রেখেই আমরা প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের যতই দুর্বলতা থাকুক, তার উজ্জ্বল দিকটিই প্রধান। আমাদের জনগণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, সংগ্রাম করেছেন এবং পেয়েছেন। এটি প্রথম কথা। কিন্তু দ্বিতীয় একটি কথাও আছে, কিসের জন্য স্বাধীনতা, কাদের জন্য স্বাধীনতা? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে যাহোক, এই যুদ্ধে আমাদের অনেকগুলো সংস্কার, বিশ্বাস এবং মূলচিন্তার গোড়া ঘেঁষে কোপ বসিয়েছে। আমরা দেখেছি আমাদের সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠাবান এবং সমাজদরদী বলে খ্যাত লোক চরম মুহূর্তে আমাদের গণ-সংগ্রামের বিরোধিতা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠাবান লোকগুলোই পাকিস্তানের নামে আমাদের গোটা সমাজটাকে শাসন করে আসছিল। তারা সব সময় বলত, যা করছে সব আমাদের জনগণের কল্যাণের জন্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও হয়েছে। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে নজরে না পড়ার কথা নয়, কিছুসংখ্যক মানুষ রাজনীতিতে সংগ্রামীদের কাতারে ছিলেন। অথচ তাদের মন-মানসিকতা, শ্রেণীভিত্তিক লোভ এসবের কোনও পরিবর্তন হয়নি। তাই তারা স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সমাজতন্ত্র ইত্যাদির শ্লোগান দিয়ে প্রকৃত সমাজতন্ত্র এবং জনগণের প্রকৃত দাবির বিরোধিতাই করেছেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এরকমটি ঘটছে। কিছুসংখ্যক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যাদের মন-মানস পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গঠিত হয়েছে এবং নতুন সাংস্কৃতিক দিগন্তের উন্মোচনের বিদ্যাবুদ্ধি, সদিচ্ছা এসবের কোনটিই নেই, তারাই আমাদের সংস্কৃতির চালক হয়ে বসেছেন। তারা নতুন বাঙালি-সংস্কৃতির কথা বলেই নতুন বাঙালি-সংস্কৃতির বিরোধিতা করছেন। নতুন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃজনের দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তারা এই সংস্কৃতির

মোড়লদের মানসিক সন্নিহিতি কিসের সঙ্গে, সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হওয়া সবিশেষ প্রয়োজন। কোন ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতি এঁদেরকে টিকিয়ে রেখেছে, সে রাজনীতির চরিত্রটি ভালভাবে জেনে রাখা উচিত। জানা, বোঝা এবং উপলব্ধিতে ফাঁক রেখে সত্যিকারের কল্যাণধর্মী কোনকিছু করা সম্ভব নয়।

এখন সকলেই উপলব্ধি করেছেন, উনিশশ' সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ একটা প্রকাণ্ড রাজনৈতিক ভ্রান্তি। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ বা তাঁর পূর্বের নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের দ্বিজাতিতত্ত্ব আসলে মন গড়া জিনিস। বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও সংযোগ নেই। তবু বাংলার মুসলমান পাকিস্তান চেয়েছিল তার একটি সাক্ষাৎ কারণ তো নিশ্চয়ই ছিল। বাংলার মুসলমানেরা হিন্দু ভূস্বামী এবং বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুকম্পার পাত্রে পরিণত হবেন বলে আশঙ্কা করেছিলেন। তাই বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় পশ্চিমা সন্তানদের সঙ্গে আঁতাত গড়ে পাকিস্তান দাবি তুলেছিলেন। চব্বিশ বছর পর দেখা গেল, যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি, সেই জিনিসটিই আগাগোড়া ভিত্তিহীন। বাংলাদেশের জনগণের মন-মানস যে উপাদানে গঠিত হয়েছে তা হিন্দুর হোক, মুসলমানের হোক, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং আদিবাসী যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন তাই-ই আমাদের বাংলার সংস্কৃতি। বাংলাদেশে সংস্কৃতির এই রূপরেখাটি আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পরেই আভাসিত হয়ে উঠেছে। এই সংস্কৃতিতে বিভাগ-পূর্ব আমলের বাঙালি সংস্কৃতি বলতে যা কিছু বোঝাত তার অনেক কিছু থাকলেও এ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বিপ্লবের অর্থ তো ধ্বংস নয়, পুনর্গঠন। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বাংলার মনীষীবৃন্দের চিন্তা-চেতনার স্থান নিশ্চয়ই আছে। সে সঙ্গে গ্রাম-বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ যা এক সময়ে প্রায় অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান কবিয়ালের মুখে 'ময়মনসিংহ গীতিকা', পূর্ববঙ্গ গীতিকার আকারে নিঃসৃত হয়েছে, 'মনসামঙ্গল' ইত্যাদি কাব্যে আকারিত হয়েছে, প্রাণের আকুতি-বেদনা-আকাঙ্ক্ষা ভাটিয়ালি, জারি, সারি; এ সকল গানে ফেটে পড়েছে— তাও আছে। কোন রাজশক্তির বা রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি বলে তা তুচ্ছ বা ফেলনা নয়। আমাদের জীবন থেকে এসব উঠে এসেছে বলেই এখনো তাজা, সজীব এবং হৃদস্পন্দনে ভরপুর। জনগণের এই আবেগের ঘরে আমাদের নাড়া দিতে হবে এবং জীবনের এই আগুনকেই যুগের সমস্যা, সংগ্রামের খড়কুটোতে সহস্র শিখায় জ্বালিয়ে তুলতে হবে। এই কাজটি যত সুচারুরূপে এবং যত কম সময়ে করা যায় ততই পূর্ণাঙ্গ এবং একটি সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি শীগগির সৃজিত হবে।

এখন কথা দাঁড়াচ্ছে, বাংলাদেশে কি সমাজতন্ত্র সত্যি এসে গেছে? কানাঘুষো চলছে বটে কিন্তু সমাজতন্ত্র আসেনি। আসবে কি? হ্যাঁ; আসতে পারে, যদি জনগণ দাবি করে। আমাদের দেশের জনগণ একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তাঁদের আত্মনির্ভরতা এবং সংঘ-শক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়— একথাটি বুঝে ফেলেছেন। তাঁদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতাও অনেকগুণে বেড়েছে। তাঁরা জানেন, তাঁরা সম্মিলিতভাবে শক্তি প্রয়োগ করে জীবনকে অনেকদূর সুখী এবং সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন। এই শক্তিসচেতন জনগণকে বিপথে

পরিচালিত করাও খুব সহজ। সামাজিক দাবি উপেক্ষা করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য উঠে-পড়ে লেগে যেতে পারে। পথে-ঘাটে প্রায়ই মানুষকে বলতে শোনা যায়, অমুক ছাত্রনেতার অতখানি বাড়ি, অমুক নেতার অত টাকা ইত্যাদি। এটা এখন একটি সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা নেতা, উপনেতা এমন কি যুব নেতাও নয় তারাও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়েছে। তাঁদের গাড়ি চাই, বাড়ি চাই। কেউ দেবে না, আইন সাহায্য করবে না, কিন্তু তারা লুঠ করবে, হাইজ্যাক করবে, জোরে দখল করবে। তাদের মোক্ষম যুক্তি দেশের উন্নতির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা অংশগ্রহণ করেছে। দেশের উন্নতি যদি না হয় ভাগ্যবানদের অনুসরণে নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধনের অধিকার তাদের নিশ্চয়ই রয়েছে। বিশেষত হাতে যখন অস্ত্রপাতি আছে, পরোয়াটা কিসের। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, আমাদের সমাজে এক ধরনের নৈরাজ্য চলছে। এই অবস্থার উপশম যদি না করা যায়, তাহলে সমাজতন্ত্র আসবে না এবং সাধারণ মানুষও কোনদিন তাদের অধিকার আদায় করতে পারবে না।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও এই ধরনের নৈরাজ্যের হাওয়ার অনুপ্রবেশ ঘটছে। যোগ্যতা থাক না থাক, কাজ কিছু হোক না হোক, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কর্মীরাও আশাতীতভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পর যেমন কলেজের আরবি, ফারসি অধিকাংশ শিক্ষক রাতারাতি অধ্যক্ষ বনে গিয়েছিলেন, এখনো সে রকম কিছু লোক প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হচ্ছেন। তাঁদের একমাত্র যোগ্যতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের গড়মিল নেই এবং তারা বাঙালি অর্থাৎ কলাবরেটর বলে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নেই। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একটি বিভাগে কোন একজন শিক্ষক প্রফেসর মনোনীত না হওয়ায় ক্ষেপে গিয়ে তার সমর্থক অনুগত ছাত্ররা নির্বাচকমণ্ডলীর বাড়ি গিয়ে হামলা করেছেন বলে কাগজে সংবাদ পড়েছি। একজন ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে কতদূর অযোগ্য হলে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করতে পারেন, তা অনুমান করা মোটেই দুষ্কর নয়। শিক্ষকেরা নিজেদের পদবৃদ্ধির জন্য যদি এতদূর উৎসাহিত হয়ে পড়েন এবং ছাত্রদের ব্যবহার করে থাকেন, দেখা যাবে প্রত্যেক শিক্ষকের কিছু কিছু সমর্থক ছাত্র রয়েছে এবং শিক্ষকেরাও ছাত্রদের দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে তুলবেন। শিক্ষকেরা যদি এই করে সময় এবং শক্তি ব্যয় করেন, নতুন সংস্কৃতি এবং শিক্ষানীতি যা বর্তমান বাংলাদেশের অপরিহার্য সামাজিক দাবি তার কি হবে? দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকেরাও এই পদ বৃদ্ধির খেলায় অবতীর্ণ হবেন এবং তা কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থাই যদি না হয়, সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা, সংস্কৃতি তো হাওয়া ফুঁড়ে জন্মাতে পারে না।

তেইশ-চব্বিশ বছর বড় কম সময় নয়। এই সিকি শতাব্দী পরিমাণ সময়ের মধ্যে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিটি স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। বাংলাদেশের

সাহিত্যে দু'তিনটি কবিতার বই, দু'তিনটি উপন্যাস, দু'তিনটি প্রবন্ধের সংকলন, দুটি কি তিনটি উল্লেখ করবার মত নাটক বা অ-নাটক এই-ই তো আমাদের মোটামুটি মানস ফসল। এই সাহিত্য নিয়ে বিশ্বের দরবারে হাজির হওয়া দূরে থাকুক, সামগ্রিক বাংলা-সাহিত্যের উৎকর্ষের নিরিখে এ আর এমন কি! কালজয়ী এবং দেশজয়ী হওয়ার স্পর্ধা রাখে এমন কোন সাহিত্য এ দেশে রচিত হয়নি। তবু বাংলা ভাষা-ভাষী জগতে বাংলাদেশের সাহিত্যের যে একটি বিশেষ স্থান আছে আমরা মনে করছি, তার কারণ আমরা অত্যধিক অযৌক্তিক আশাবাদী এবং বিচার বোধ বর্জিত। লাভ-ক্ষতি খতিয়ে দেখার ক্ষমতা আমাদের খুবই সামান্য। কেউ যখন আমাদের পিঠ চাপড়ায়, তখন মহানন্দে আমাদের দেশের গর্জনকারী চতুষ্পদ জন্তুটির মত লেজ নাড়তে থাকি। অপরের স্তোকবাক্যে মোহিত হয়ে দন্ত ব্যাদান করে এরকম ভাবখানা করি যেন সত্যি সত্যি বাংলাদেশের নির্মাণ-বুদ্ধি, স্বপ্ন, কল্পনা, সংঘাত সব আমাদের জীবনে ধারণা করেছি। আসলে এসব কি সত্যি? যে-কোন দেশের চব্বিশ বছরের সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সাথে আমাদের তুলনা করে দেখতে পারি। এই চব্বিশ বছরে ক'টি বিজ্ঞানের মৌলিক আবিষ্কার এ দেশে হয়েছে! পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা এবং শারীরবিদ্যা, প্রযুক্তি এবং গবেষণার দিক দিয়ে কতদূর উৎকর্ষ অর্জন করেছে? ক'খানি গবেষণাসমৃদ্ধ ইতিহাস লেখা হয়েছে! সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি এসব বিষয়ে আমাদের মাটি এবং সমাজ সম্পদ নিয়ে কোন বই মাতৃভাষা বাংলায় নয়, ইংরেজিতেও প্রকাশ পেয়েছে কি? বিশটি বিষয় মিলিয়েও একগণ্ডার অধিক আমাদের পণ্ডিতদের লেখা ভাল বই এ দেশে কিংবা বিদেশে প্রকাশিত হয়নি। অথচ এসব বিষয়ে সুদক্ষ পণ্ডিত বানাবার জন্য বছরে প্রচুর টাকা খরচ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ফি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ থেকে শিক্ষার্থীরা বিদেশে যাচ্ছেন এবং বিদেশ থেকে ফি মাসেই পণ্ডিতেরা কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এমন কি স্কুলগুলোতেও বিলেত, আমেরিকা-ফেরতাদের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু তার নগদ ফল হয়েছে এই যে, বিলেত, আমেরিকা ফেরতাদের দৌরাত্ম্যে সমাজে টেকা একরকম দায় হয়ে পড়েছে। এই বিলেত, আমেরিকা-ফেরত পণ্ডিতেরা বিলেত, আমেরিকার কথা স্মরণ করে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেন। স্বদেশের মাটির দিকে তাদের দৃষ্টি কদাচিৎ আকৃষ্ট হয়। সলিড কিছু করার বদলে বিলেতি বিদ্যের গুমর দেখাতেই তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ পেয়ে থাকেন। বিলেতে যেয়ে আমাদের সাহিত্য এবং ইতিহাস নিয়ে গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন এমন দু'তিনখানা বই নেড়েচেড়ে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। দেখে শুনে ধারণা জন্মে গেছে যে ও-ধরনের বই ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরির ভিড়ের মধ্যে বসে চা সিগ্রেট খেয়ে আড্ডা গুলতানি মেরে তিন কি সাড়ে তিন মাস সময়ের মধ্যে অনায়াসে লিখে দেয়া যায়। কিন্তু এসকল মহাগ্রন্থ রচনা করতে আমাদের পণ্ডিতেরা বিলেত যেয়ে তিন তিন বছর কাটিয়েছেন এবং দেশে ফিরে আর তিন তিন বছর বিলেতের গল্প করে কাটাচ্ছেন। কি অপূর্ব বিদ্যা, বিলেতি ডিগ্রির কি চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য! আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ওদের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে আমরা মনে

করছি, পড়াশুনা ইত্যাদির কাজ ভালভাবেই চলছে। প্রকৃত ভালটা তখনই চোখে পড়ে, যখন গোটা দেশের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ, অপকর্ষের দিকে তাকাই। দেশ দেশের হিসেবে চলে, সমাজের দারিদ্র্য বেড়েছে, সমাজের অজ্ঞতা দিনে দিনে পাষাণের মত কঠিন আকার ধারণ করছে। সবল দুর্বলকে অত্যাচার করছে। আর আমাদের পণ্ডিত মহাশয়েরা পরস্পরের পিঠ চুলকে, খুনসুটি দিয়ে দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছেন। আর শাসক পরিবর্তনের সময়ে নিজেরা সদলবলে জয়ধ্বনি দিয়ে বলেন, আমরাও আছি তোমার সাথে। এই সাথে থাকার কাজটি তখন থেকেই শুরু হয়, যখন সিংহাসনে চড়ার সময় আসে। আমাদের দেশের পণ্ডিতদের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকার প্রতি ঘৃণা করাটাও অনেক সময় মনে হয় পণ্ডশ্রম। জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য বিষগুলোর চর্চা যেহেতু এখনো আদিম পর্যায়ে রয়ে গেছে, তাই সংস্কৃতি বলতে সাধারণ্যে একটি ধারণা জন্মে গেছে। তাঁরা সংস্কৃতি বলতে মনে করতে আরম্ভ করেছেন কটি কবিতা, কটি গল্প, উপন্যাস, ভাওয়াইয়া গান, নজরুল গীতি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলোর কোন স্থান যেন আমাদের সংস্কৃতিতে নেই। আমাদের দেশে তাই সংস্কৃতিবান বলতে সেই শ্রেণীটিকেই বোঝায়, যারা শুধু কবিতা লিখার আজীবন ব্যর্থ প্রয়াস করেন, গল্প লিখতে যেয়ে মার খান, বাজে উপন্যাস লিখেন। এসবের সঙ্গে আরো দুটো গুণ থাকা চাই। প্রভুভক্তি এবং মার্জিতি। পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসের বদল হয় প্রাকৃতিক নিয়মে আর আমাদের দেশের পণ্ডিতদের প্রভু বদল হয় ক্ষমতার নিয়মে।

বিদ্যা, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের ভূমিকা কি সে বিষয়ে নিবিড়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন, এরকম আধা ডজন মানুষও আমাদের দেশে নেই। এই না থাকাটা যে কতটুকু না থাকা একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যায়। যদি আধা ডজন তেমন মানুষও থাকতেন বাংলাদেশে সুস্থভাবে জ্ঞান এবং বিদ্যা চর্চার একটা আবেষ্টনী রচনা এতদিনে হয়ে যেত। সুস্থ জ্ঞানচর্চার একটা ক্ষেত্র যদি তৈরি হত, তাহলে বর্বরেরা পদ্মার চর দখল করার মত লাঠি বাগিয়ে হৈ হৈ করে ছুটে আসতে পারত না। এতদিনেও জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভাবকল্পনার ক্ষেত্রে আমরা এমন অসহায়, এমন কাঙাল থেকে যেতাম না। আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ানো হয়, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য কি সে সম্পর্কে বিজ্ঞানের শিক্ষকেরাই শেষ পর্যন্ত অনবহিত থেকে যান। বাংলাদেশের সেরা বিজ্ঞানী বলে কথিত মানুষটি যখন শুধুই অর্থের জন্য নিম্নশ্রেণীর দীনিয়াত বই লিখেন, দেখে-শুনে হতবাক না হয়ে উপায় থাকে না। শ্রেষ্ঠ লোকটিই যখন এরকম, কম শ্রেষ্ঠরা কি রকম খুব সহজে বুঝে নেয়া যায়। যে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বলে মানুষের জীবন সুন্দর, স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠছে, সমাজ উন্নত হচ্ছে তেমনি বিজ্ঞানচর্চা আমাদের দেশে কই? আমাদের দেশে আবিষ্কার কই? আর বিজ্ঞানীও বা কোথায়? বস্তুত এই দেশে ধর্মান্ধ মোল্লা এবং বিজ্ঞানীর মধ্যে খুব তফাৎ নেই।

সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের জীবনের বাস্তব যোগাযোগটা কোথায়? যদি বাস্তব যোগাযোগ নাই-ই থাকে

তাহলে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসকল বিষয় পড়ানো এবং সেজন্য বিদেশে লোক পাঠিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করার সার্থকতাটা কোথায়? জ্ঞানকে যদি জীবনে প্রয়োগ করা গেল না, সে জ্ঞানের চর্চা করে কি লাভ? সমাজ কেন সাদা হাতির মত এই পণ্ডিতদের পুষবে, কেন দুধ-ঘি খাইয়ে তাদের মোটা-তাজা করবে? পণ্ডিতেরা পণ্ডিতদের জায়গায় অনড় স্থির থাকবেন। আমাদের দেশের পরম উপকারী জন্তুটির মত মনের সুখে জাবর কাটবেন এবং নতুন প্রভু পেলেই প্রভু বদলের আনন্দে চিৎকার করে উঠবেন। আর সমাজের দুঃখ-দুর্দশা বাড়বে এ তো হতে পারে না। এক সময়ে সমাজের চক্ষুষ্মান মানুষদের এই পণ্ডিতদের প্রতি তাকাতে হয়, নইলে সমূহধ্বংস অনিবার্য। জ্ঞান মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। পণ্ডিতদের প্রভাবে আমাদের সমাজে নানান বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে কিনা সেটিই দেখতে হবে। সমাজে পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই একথা সত্যি হতে পারে না। তবে এমন পণ্ডিত প্রয়োজন যাঁদের প্রভাবে গোটা দেশের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠবে, বহুকালের স্থবির জীবন ভেতর থেকে নড়ে উঠবে। তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতি মানুষে মানুষে ভেদাভেদের প্রাচীরে শানানো আঘাত করবে, মানবিক বৃত্তিগুলোর উৎকর্ষ সাধন করবে, সুন্দরের বোধকে জাগ্রত, প্রাণবন্ত করে তুলবে, জড়কে পোষ মানাতে শেখাবে। শুধুমাত্র ভাষা এবং সাহিত্যকে আশ্রয় করে এসব হওয়া সম্ভব নয়। জীবনের অন্যান্য বিষয় এবং অন্যান্য মানববিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত না হলে সাহিত্যের উন্নতি হবে এমন আশা করা সুদূরপরাহত। সাহিত্য তো সমাজবদ্ধ জীবনের নানা চিকন মোটা প্রকাশ, আমরা আশা করব কোত্থেকে?

আমাদের সামাজিক এই যূথবদ্ধ স্থবিরতাকে নানান দিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে আলোকিত আঘাত করতে হবে। সে পথেই আমাদের সমাজে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব সূচিত হবে। উন্নততর সাংস্কৃতিক বিপ্লব উন্নততর রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্ম দেবে। সুন্দর সমাজই রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রাণ কথা। একটা পর্যায়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক কর্মীদের সাংস্কৃতিক কর্মীর ভূমিকা পালন করতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীদের রাজনীতিসচেতন হতে হবে। সমাজকে সুন্দর করা রাজনীতি এবং সংস্কৃতির যৌথ দায়িত্ব।

'বিদ্রোহহীন জীবন বাঙালির আত্ম-অস্তিত্বের অস্বীকৃতি।' বাঙালি বারেবারে বিদ্রোহ করেছে কিন্তু লিখিত ইতিহাসের কোনও পর্বে বিদ্রোহকে জাতিগত খাতে প্রবাহিত করে দীর্ঘদিনের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম যেমন দিতে পারেনি বাঙালি, তেমনি পুরোপুরি বিদেশি, বিজাতির অধীনতার বন্ধনও মেনে নিতে পারেনি। প্রতিটি বিদেশাগত চিত্তস্রোতের সঙ্গে সংঘাতে বাঙালি জনগণের মজ্জাগত শৌর্য ফণা মেলেছে এবং সৃজনশীলতা উল্লম্ফিত হয়ে উঠেছে। বাঙালির প্রথম প্রামাণ্য ছন্দোবদ্ধ বাণী বৈদিক নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় বদ্ধমতের বিরুদ্ধে সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের নতুন জীবনবোধের প্রেরণাময় ধ্বনি। তেমনি সামাজিক বিদ্রোহ মুখিয়ে তুলেছে বৈষ্ণব গীতিকার প্রেমময় আর্তি। 'ময়মনসিংহ গীতিকা', 'মঙ্গলকাব্য'

সর্বত্র—বিদ্রোহ এক সমাজ আদর্শের বদলে আরেক সমাজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিদ্রোহ তাবৎ বাঙালির শিল্প সৃজনলোকে রক্তবাহী শিরার মত প্রসারিত।

আধুনিক বাংলা-সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তা তো পুরোপুরি প্রতিবাদেরই সংস্কৃতি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, মাইকেল, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে কাজী নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত সকলে প্রচলিত সমাজ, ধর্ম এবং লোকাচারের বিরোধিতা করেছেন একদিকে, অন্যদিকে কেউ স্পষ্টভাবে, কেউ আভাসে-ইঙ্গিতে আরেকটি মহত্তর, সুন্দরতর সমাজের ছবি শিল্পরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলার গৌরবময় সাহিত্য স্রষ্টাদের সৃষ্টি থেকে যদি সামাজিক বিদ্রোহ, নতুন মানবিক মূল্যমান প্রতিষ্ঠার বিদ্রোহ আলাদা করে ফেলা হয় তাহলে কি বাংলাভাষা বিশ্বের সমৃদ্ধ ভাববাহী ভাষাপুঞ্জের আসন থেকে রাতারাতি প্রাদেশিক ভাষা হয়ে দাঁড়ায় না? রামমোহনের ধর্মীয় এবং সামাজিক মতবাদ ছাড়া তাঁর সাহিত্যের কতটুকু মূল্য? বিদ্যাসাগরের সৃষ্টিকর্ম থেকে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছেঁকে আলাদা করে যদি ফেলা হয়, তাহলে তো তিনি টোলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে দাঁড়ান। রামমোহনের ধর্মীয় এবং সামাজিক বিপ্লব বাদ দিলে অমন সূর্য-সঙ্কাশ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের গর্ব বাঙালি কিভাবে করত? ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জান দেয়া-নেয়ার মহৎ খেলা এবং রুশ-বিপ্লবের অভিনব জঙ্গী মানবতার ডাকাতিয়া বাঁশির ডাকেই তো কাজী নজরুলের কণ্ঠ নিনাদিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় যে তীব্র আবেগ বিচ্ছুরিত হয়েছে, যে কূল ছাপানো ভালবাসা লহরিত হয়েছে তা কি প্রচলিত সমাজকে ভেঙে-চুরে নতুন করে বানানোর, নতুন মানব সম্বন্ধ রচনার ঐকান্তিক হার্দ্য প্রয়াস নয়?

বাংলা-সাহিত্য প্রতিবাদের, প্রতিরোধের, বিদ্রোহের সাহিত্য। কিন্তু সে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ পূর্ণাঙ্গ নয়। সে দোষ বাঙালি সমাজের। বাঙালি সমাজে বাংলার মহত্তর মানবদের চিন্তা-ভাবনা মাত্র আংশিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজ রাজত্বের কারণেই এমনটি হয়েছে। বাঙালি মুসলমান সমাজে পার্শ্ববর্তী ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের মত তেমন মনীষী পুরুষের জন্ম হয়নি, যিনি চিন্তা-ভাবনার বলে আপন সম্প্রদায়ের মানুষকে অগ্রগামী করতে পেরেছেন। মনীষী না জন্মাবার সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তার আলোচনার স্থান এ নয়। সে যাহোক, আধুনিক চিন্তাসমৃদ্ধ বিরাট কোন পুরুষের অভিভাবকত্বের অভাবে বাঙালি সমাজের ভেতর থেকে ধর্মীয় ডগমা বা বদ্ধমত এবং সামাজিক আচারের জঞ্জাল ভেদ করে কোন বিরাট মানুষ প্রবল প্রাণশক্তির তোড়ে মাথা তুলতে পারেনি। তার ফল দাঁড়িয়েছে ধর্মীয় বদ্ধমত এবং সামাজিক সংস্কারের কোলঘেঁষা অন্ধকার সামাজিকভাবে কাটিয়ে ওঠা এখনো সম্ভবপর হয়নি। এখনো সকলে ধর্মীয়ভাব অনুভাব এবং অনুশাসনকে অন্ধভাবে মেনে চলেন অথবা যাঁরা একটু উন্নাসিক, নিজেদেরকে সমাজের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ভাবতে শিখেন। নিজেকে আলাদা ভাবলে কি সত্যি সত্যি আলাদা হওয়া যায়? কোন মানুষ আপন ছায়ার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে, কোন মানুষ আপন সমাজের ওপর নির্ভরহীন হয়ে বাঁচতে

পারে? মানুষ সব সময়ে সামাজিক জীব, তার যা কিছু উন্নতি, অগ্রগতি, সুখ-সমৃদ্ধি সব সমাজেই সম্ভব। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকদিন সে বোধ আসেনি। যে সকল কবি-সাহিত্যিক অল্প-বিস্তর সামাজিক ভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন, তাঁরা সমাজকে তের শ' বছর পিছিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। ভূতের পা পেছন দিকে, তাই তাঁদের দ্বারা বাঙালি মুসলমান সমাজের কোন লাভ হয়নি। ধর্মের আওতাভুক্ত, বিধি, আচার, সংস্কার বিশ্বাস, রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন এসব অস্বাস্থ্যকর জেনেও কোন লেখক শৈল্পিকভাবে বা বিদ্রোচিত অথবা মানবোচিতভাবে এসবকে চ্যালেঞ্জ করেননি। যেখানে পুরনো বিশ্বাস, পুরনো মূল্যবোধের প্রতি সজ্ঞান মেধাবী চ্যালেঞ্জ নেই, সেখানে মহত্তর সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? যে যূথবদ্ধ প্রথায় প্রশস্তি রচনা করে, সে তো দাসত্ব করে, তার অন্তরাত্মা পরাধীন। এই পরাধীন অন্তর থেকে কেমন করে স্বাধীন চিন্তা যা মহত্তর সৃষ্টির শোণিত, উত্থিত হবে? আবার সমাজকে পিঠ দিয়ে একা আনমনে নিজের ভাবনা-চিন্তা নাড়াচাড়া করার মধ্যেও ব্যক্তির সাধনার পূর্ণতার অভিলাষ কোথায়? পূর্ণতার সাধনা যেখানে নেই, সেখানে ব্যক্তির একান্ত অন্তরঙ্গ, আবেগ কিভাবে খেলা করে? এখনো পর্যন্ত কোন বাঙালি মুসলমান লেখক তাঁর সমাজের প্রাণহীন আচার পদ্ধতি, মূঢ়তা, স্থূল বিশ্বাস এসবকে চ্যালেঞ্জ করেননি। রাজনৈতিক উপন্যাস কেউ কেউ লিখেছেন, লিখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত অর্থে রাজনীতি বলতে যা বোঝায়, তা তো এক ধরনের ক্ষমতালোভী মানুষের ক্ষমতা দখলের ফন্দি মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। রাজনীতি মানবসমাজের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি নির্ধারণের নিয়তি, যারা রাজনীতি করেন তারা বিশ্বাস করলেও লেখকেরা, কবিরা, সাহিত্যিকেরা রাজনীতি এবং সংস্কৃতির কোন মানসিক মেলবন্ধন সাধনা করতে পারেননি বললেই চলে। অথচ মোস্তাফা কামাল পাশার তুর্কিতে এই রাজনীতিই ধর্মীয় জাড্য, সামাজিক কু-রীতি খেদিয়ে তাড়িয়েছে। সে তো অনেকদিন আগের কথা। তুর্কিতে অনেকদিন আগে যা হয়েছে আমাদের দেশে এখন তা হওয়া সম্ভব নয় কেন? এই প্রতিবাদের অভাবে আমাদের সমাজের জ্ঞানী-গুণী মানুষকেও অন্ধ তামসিকতাসম্পন্ন মানুষদের দাস হয়ে থাকতে হয়। যে দু'একজন মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করেন তারা বাচাল। তাদের সঙ্গে সে শল্য-চিকিৎসকের তুলনা করা যায়, যে রোগ দূর করার বদলে রোগী মারে। মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং মানুষের প্রতি মমতাহীন কবি, সাহিত্যিক কিংবা সমাজসংস্কারক কারো কোন দাম নেই।

সমাজের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। সুতরাং মুসলমান সমাজ থেকে আগত জ্ঞানবান, বিবেকবান, চিন্তাশীলদেরই দায়িত্ব সামাজিক অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং বিবেকহীনতার বিরুদ্ধে তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং সপ্রেম বিদ্রোহের আওয়াজ তোলা। মানুষের মন দিয়েই মনের পরিবর্তন সম্ভব। বাহ্যিক সমস্ত প্রচেষ্টা মনের জাগরণ, চৈতন্যের উদ্বোধন ছাড়া ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেউ কেউ বলেন, ধন বণ্টনের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে ওসব থাকবে না। কিন্তু সাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তো সর্বপ্রথম সংস্কারমুক্তির প্রয়োজন। ধর্মীয় সংস্কার এমন জিনিস যা সোজা জিনিসকে বাঁকা

দেখতে বাধ্য করে। এই বাঁকা দেখতে বাধ্য হয়েছিল বলেই ভারত দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে। অনেকে এই কথাটি সহজে বুঝতে চান না বলেই হিন্দু কমিউনিস্ট এবং মুসলমান কমিউনিস্ট শব্দ দুটি আমাদের সমাজে চালু হয়েছে।

এই বাংলাদেশে যেখানে শতকরা আশিজন মানুষ মুসলমান— আশিজনের মধ্যে উনসত্তর জন সংস্কারান্ধ, সেই সমাজে আজকে যদি একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়, তার চেহারা কি হবে? ধর্মীয় সমস্ত অনুশাসনের অনেকগুলো কি রদ করতে হবে না? যদি তাই হয়, জোর করে সেসব কি সম্ভব? জ্ঞানের সাহায্যে নিষ্কলঙ্ক মানবতার বাণী প্রচার করে তার কি একটা ক্ষেত্র রচনা করতে হবে না? সে কাজ শিল্পীর, সে কাজ কবির, সে দায়িত্ব ঔপন্যাসিকের। শুধু মুসলমান সমাজ কেন, হিন্দুসমাজে কি কুসংস্কার নেই? গোটা সমাজদেহে কি বর্ণাশ্রম ধর্ম জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে নেই? হিন্দুসম্প্রদায় থেকে আগত চিন্তাশীল মানুষদের এসবের বিরুদ্ধে ধ্বনি তোলা প্রয়োজন। একইভাবে সাঁওতাল, মগ, গারো, হাজং সকল ধর্মের, সকল বর্ণের মানুষের মধ্যে একটা প্রীতির সঞ্চার করা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, যার প্রভাবে প্রত্যেক সমাজ ভেতর থেকেই সম্প্রদায়গত বদ্ধমতের আবরণ ঠেলে ফেলে দিতে পারবে। এক ধর্ম, এক সম্প্রদায়ের অনাচারের বিরুদ্ধে অন্য সমাজের মানুষের কিছু না বলাও আরেক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা। কেননা যেভাবেই হোক না কেন যে কোন মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আবদ্ধ করে রাখে তাকে শোধরাবার চেষ্টা না করা, নিজের জ্ঞান থাকলে সে জ্ঞানের অংশভাগী না করাও মানুষের প্রতি আরেক ধরনের কপটতা। কিন্তু বিপ্লবে কপটতার স্থান নেই। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা যে রকম তাতে শুরুতেই এক ধর্মের, এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্যকে উপযাচক হয়ে উপদেশ দিতে গেলে লাভের চাইতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, তার কাঠামো ভেঙে ফেলেছে। এখন সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে বাংলাদেশে ধর্মের বদ্ধমতগুলো উড়িয়ে দিতে পারলে মানুষে মানুষে অন্তরের মিলনটা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। মানুষ শুধু মানুষ এই পরিচয়ে চিহ্নিত করার সর্বাঙ্গীণ প্রয়াসটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল কথা। আমাদের দেশে সে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে। যারা বুঝতে চায় না, তারা মূঢ়, দৃষ্টিহীন এবং মানবোচিত প্রেমহীন।

আমাদের সমাজের এখন একটি প্রচণ্ড ওলট-পালট অবস্থা। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি এবং একটি নতুন সমাজ সৃজনের পূর্বশর্ত যদি একে ধরে নেয়া হয়, তাহলে দোষের কিছু নেই। কিন্তু সমস্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে, সমস্ত ভাঙন থেকে সুশৃঙ্খল পরিবেশ বেরিয়ে আসে, ভাঙনের মুখে নতুন চর, নাবাল জমি জাগে একথা তো সত্যি নয়। নৈরাজ্য নৈরাজ্যকেই ডেকে নিয়ে আসে। স্বাধীনতার পর পর একটি শ্রেণীর বদলে আরেক শ্রেণী স্বাভাবিকভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার জন্য, ক্ষমতা অপ্রতিহত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া, বণ্টন পদ্ধতি, যাবতীয় সামাজিক সম্বন্ধ, বৈদেশিক সম্পর্কের মধ্যেই এই

শ্রেণীর বৃদ্ধির উপাদান রয়েছে। এই শ্রেণী যদি তার সপক্ষে যা কিছু আছে, সবকিছুকে ব্যবহার করে গ্যাঁট হয়ে বসে আমাদের জনগণের কিছু হবে না। তথাকথিত প্রতিটি জাতীয় সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিটি জাতি যা লাভ করে থাকে, যেমন জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সরকার, তার বেশি পারেন না। কঠোর বাস্তবের শিক্ষা এই, সুস্থ মানুষ অকারণে কিছু করে না। আমাদের দেশের শ্রমিক— কৃষক নিম্নবিত্ত মানুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই তিন বস্তুর জন্য অংশগ্রহণ করেছিলেন— এটা কিছুতেই সত্য হতে পারে না। তাদের এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার পেছনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ বর্তমান ছিল। রাজনীতিকে জনগণের সর্বাঙ্গীণ ভাগ্যের নিয়তি যারা মনে করেন, তাদের কর্তব্য হবে এই বিশৃঙ্খলা, এ সন্তোষকে সঠিকভাবে প্রবাহিত করিয়ে জনগণের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে তাঁদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করে স্বাদেশিক এবং বৈদেশিক উভয় অর্থে শোষণহীন একটি সমাজ গঠনের জন্য শরীর এবং মনের দিক থেকে পরিপূর্ণভাবে তৈরি করে তোলা। তা যদি না হয়, তাহলে অপর সম্ভাবনাটিই কার্যে পরিণত হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না।

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক নৈরাজ্য সংস্কৃতি চিন্তায়ও প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেক চিন্তাশীল মানুষ এখন চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন। তাঁরা কিছু বলতে চান না। যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল তাঁদের কথা বলছিনে। তাঁরা তো সব সময়ে নিজের স্বার্থের কথা ভাবেন— এটা একটুও বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু যাঁরা সত্য স্বাধীনতার পূজারী, যাঁরা মানুষকে ভালবাসেন, যাঁরা নিজের দেশ, জাতি এবং দেশের মানুষকে ভালবাসেন, তাঁরও কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। কারণ, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় এ সময়ে চেনা অনেকটা কঠিন। তাই ভাল কথা বললেও তার প্রতিক্রিয়া খারাপ হবে মনে করে চুপ থাকা শ্রেয় মনে করেছেন। এঁরা প্রকারান্তরে এই নৈরাজ্যের শক্তির কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁদের মনোভাব মারাত্মক। কেননা, রোগ যখন প্রবল, জোরাল ওষুধের প্রয়োজন তখন বেশি। যখন পারিপার্শ্বিকতার কারণে স্থির চিন্তা করা একরকম অসম্ভব, তখনই স্থির চিন্তা করার সময়। নৌকা যখন ঝড়ে পড়ে, তখনই দৃঢ়ভাবে হাল ধরে ঠাণ্ডা মাথায় তীর লক্ষ্য করে বাইতে হয়। নচেৎ যে বিপদের মধ্যে তরী দুলছে, সে বিপদেই গ্রাসিত হবার সম্ভাবনা অত্যধিক।

আমাদের প্রবীণ সংস্কৃতিবিশারদরা তাঁদের অভিজ্ঞতার দোহাই পেড়ে বিপদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চান। যাঁরা এ বিপদকে সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ করতে চান, তাঁদেরকে হঠকারী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিরোধিতা করছেন। যে ক্ষেত্রে তারা সরকারি কর্মচারী, পদস্থ অফিসার সরকারের আইন দেখিয়ে চিন্তার স্রোত, জীবনের উল্লাস এবং কল্পনার দাবিকে লৌহশৃঙ্খলে আটক করে রাখতে চাইছেন— এই সময়েই তরুণদের বিদ্রোহ করার সময়, ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্নের দিকে দৃষ্টি রেখে নৈরাজ্যের আওতা থেকে বেরিয়ে পড়ার সময়। প্রবীণ পদস্থ ভদ্রলোকেরা যে অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে চোখ রাঙাচ্ছেন, সে তাঁদের সুদীর্ঘ

জীবনের দাসত্বের অভিজ্ঞতা। এই মানসিকভাবে দাস সংস্কৃতিজীবীদের হাতে এতকাল আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির ভার ন্যস্ত ছিল বলেই আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কৃতিতে জাতীয় মানসের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি।

এই নৈরাজ্য, এই বিশৃঙ্খলা কিছুতেই আমাদের সমাজের শেষ কথা নয়। এই নৈরাজ্যের মধ্যেই মহত্তর সম্ভাবনার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। এই ভাঙনের কূলেই আভাসিত হবে নতুনের। আমাদের সমাজ যে ভাঙছে, আমাদের চিন্তাতে যে ঘূর্ণিস্রোত সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে মহত্তর সামাজিক সম্ভাবনা যারা দেখতে চান না তাঁদের চিন্তা কিছুতেই সঠিক চিন্তা হতে পারে না। আমাদের দেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়— এই শান্তিপ্রিয় মানুষগুলো ক্ষেপে উঠেছেন। তাঁদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, শরীরে স্বাস্থ্য নেই, রোগের ওষুধ নেই, জীবন এবং জীবিকার নিশ্চয়তা নেই। এ সবের দাবিতে তাঁরা ক্ষেপে উঠেছেন। সে সমস্তের ব্যবস্থা করা হোক, তাঁরা আপনা থেকেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন। যদি বলা হয় আমাদের মত গরিব দেশে এতসবের একসঙ্গে নিশ্চয়তা বিধান করা এত সহজ নয়। তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে, এদেরকে তুমি নিশ্চয়তা দিতে পারছ না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে একটা শ্রেণী কিভাবে আরো ধনী হয়ে যাচ্ছে। এই ধনী হওয়ার নিশ্চয়তা তারা পেল কোথায়? ধনীদের টাকা কার ব্যাংকে জমা থাকে? ধনীদের কল-কারখানায় কারা পাহারা দেয়, কারা খাটে? বিচারে ধনীদের কারা জিতিয়ে দেয়? যদি বল আগে থেকে এমন হয়ে এসেছে, ব্রিটিশ আমলে এমন এমন ছিল, এখনো এমন চলছে, করার কিছু নেই। তোমার মনগড়া কথা। ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ গভর্নর ছিল, পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানি একনায়ক ছিল, আর আমাদের আমলে আমরা তোমাকে জিম্মাদার করেছি এবং করছি এই জন্যে যে ব্রিটিশ আমলের সমাজটাকে তুমি ভেঙে ফেলবে, পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট আমলাতান্ত্রিকতার কাঠামোটা সম্পূর্ণ বদলে দেবে। তা না করে তুমি যদি সেই ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানি আমলের প্রভুদের মত ব্যবহার কর, তাদের সৃষ্ট আমলা এবং অনুচরদের নিজের চারদিকে বডিগার্ড রাখ অথবা নিজে একদল অনুরূপ বানিয়ে নাও এবং কারণ অনুসন্ধান না করে উপযুক্ত সামাজিক প্রতিবিধান করার বদলে নিজেই হুঙ্কার ছাড়তে থাক এবং নৈরাজ্যের শক্তি বাড়িয়ে তোল— সেটা আমার জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর, একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে ঘোষণা করব ।

রাজনৈতিক সংগ্রামকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনের সঙ্গে সংস্কৃতির সংগ্রামকেও এগিয়ে নিতে হবে। সুস্থ রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়া সুস্থ সংস্কৃতি কখনো আশা করা যায় না। সুস্থ সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে যাঁরা আশা রাখেন তাঁদের গৌণ কাজ হওয়া উচিত রাজনৈতিক সংগ্রামকে বিকশিত হতে সাহায্য করা। আমাদের দেশে অনেক প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বর্তমানে বক্তব্যহীন হয়ে পড়েছেন, তার কারণ হালের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে চরম এবং পরম মনে করেছেন। সে সঙ্গে তাঁদের শাসন পদ্ধতিকেও মনের দিক থেকে সমর্থন করতে পারছেন না। তা করলে তারা বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে পড়েন। বিকল্প কোন রাজনীতির

কথা চিন্তা করতে পারেন না। যেহেতু তাঁদের অনেকেরই আমাদের দেশের জনগণের উপর বিশ্বাস এবং আস্থা খুবই স্বল্প। আসলে তাঁদের নিজেদের উপরই বিশ্বাস নেই। এই আত্মবিশ্বাসের অভাবেই তাঁরা ইচ্ছার বশেই হোক বা অনিচ্ছায় হোক সামরিক সরকার দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন। এখন ব্যবহৃত হতে পেলে বেঁচে যান।

কিন্তু এ ভিন্ন সময়। আমাদের দেশের প্রতিটি শ্রমিক, প্রতিটি কৃষক নিজের শক্তির মহিমা বুঝেছে। সে হাতে-কলমে বুঝেছে তাঁর বন্দুক নিক্ষিপ্ত একটি বুলেটের সঠিক আঘাতে একজন পাকিস্তানি সৈন্য মরেছে। তেমনি আমাদের দেশের প্রতিটি তরুণ দেশপ্রেমিক উপলব্ধি করেছেন তাঁদের চিন্তা ও কল্পনার বিস্ফোরণের মধ্যেই একটি পুরনো সমাজ ধসে যাচ্ছে, একটি নতুন সমাজ সৃজিত হচ্ছে। এই নতুন সমাজ সৃজনের পদ্ধতি থেকেই আমাদের দেশে আসবে নতুন সাহিত্যিক, নতুন কালের কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক। উদ্ভব হবে ঝলমলে সব সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের।

দেশটা যেন আমাদের নয়। অন্য কেউ অদৃশ্যভাবে এই দেশ শাসন করে। ঠিক রাজনৈতিক অর্থে বলছিনে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের রুচি-সংস্কৃতির দাসত্ব করি আমরা মনে মনে। অপরের খুশি এবং অপছন্দের মাপে আমরা গড়ে উঠি। আমাদের কোন বিষয়ে জাতীয় কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অর্থে অন্ধ এবং অহংপুষ্ট স্বাদেশিকতাসর্বস্ব মনোভাবের কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই নয়। সভ্যতার মূলকথা যা জীবন জড়বস্তুকে শাসন করে, পোষ মানায়। আমাদের প্রতিবেশীদের উপকরণ সংগ্রহ করে এই দেশে একটি সভ্যতা সৃজন করতে পারব, এই বিশ্বাসে বলীয়ান মানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বিরল। তাই বিদেশ থেকে বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের দিকে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে যেমন, তেমনি বিদেশি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতির সুফলটুকু ভোগ করেই আমরা মনে করি সুসভ্য হয়ে গেলাম। বিলাত দেশটা যে সত্যি সত্যি মাটির— ঠেকে না শিখলে গোটা জীবনে অজ্ঞই থেকে যেতে হয়।

জ্ঞান সার্বজনীন। কিন্তু দেশে দেশে তার বিকাশ এবং প্রয়োগ বিধি একেক রকম। কিন্তু এই বোধটা আমাদের নেই, কেননা আমাদের অনুভূতিশক্তি খুবই ভোঁতা। তাই আমাদের শহরে স্থাপত্যের দিকে তাকালে এক নিমিষে মনে পড়ে যায় একেক খণ্ড বিলেত আমেরিকা আমাদের দেশে উড়ে এসে জুড়ে বসে গোটা দেশের উত্থানশক্তি রহিত করে রেখেছে। বিলেত আমেরিকায় স্থাপত্য কলা খারাপ কিংবা অবিকশিত বলার ইচ্ছে আদৌ আমাদের নেই বরং আমরা বলতে চাই, ওসব দেশে স্থাপত্যকলার প্রভূত উন্নতি হয়েছে, কিন্তু উন্নত স্থাপত্যের অনুকরণ করার মধ্যে আমাদের প্রকৌশলীদের মৌলিক শক্তির পরিচয় নেই। আমরা যে অনেক অনেক পশ্চাৎপদ তার প্রমাণ আমাদের সাধনা থেকে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, আধুনিক কোন দার্শনিক সূত্র, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা কিংবা অন্যকোন রকমের কলা বা জ্ঞানের উদ্ভব হয়নি— অদূর ভবিষ্যতে যে হবে তার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

আমাদের এই দেশে মজার কথা হল, যাঁদের এসব বিষয়ে ভাবার দায়িত্ব তাঁরাই মানসিকভাবে বিদেশের দাস হয়ে পড়েন। বিদেশের ভাল কিছু গ্রহণ করার মধ্যে কেন যে দোষ আছে, তেমন কথা বলছিনে। কিন্তু বিদেশি সবকিছু আমরা দাসের মত গ্রহণ করব, না স্বাধীন মানুষের মত গ্রহণ করব পুরোপুরি নির্ভর করছে আমাদের ইচ্ছার উপর। আমাদের ইচ্ছাটাও দেখতে হবে। এটি ব্যক্তিগত ইচ্ছা কি সামাজিক ইচ্ছা, তার চারিত্র্য নির্ধারণ করাও প্রয়োজন। কোন লোক রসায়নবিদ্যায় জ্ঞান লাভ করতে চাইলে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। সেজন্য রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থাদি পড়তে হবে। সেগুলো বাংলা ভাষাতে নেই। সেজন্য তাঁকে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান শিখতে হবে। এ দেশে গবেষণাগার এবং উপযুক্ত শিক্ষক নেই। সেজন্য তাঁকে সেসব দেশে যেতে হবে। কিন্তু একটা জাতির যদি হাজার হাজার রসায়নবিদের প্রয়োজন পড়ে তাহলে সকলকে প্রতিবছর জার্মানিতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়, রাশিয়ায় পাঠানো অসম্ভব। সে জ্ঞান যাতে বিদেশিরা সাফল্য লাভ করেছেন, যে-কোন মূল্যে, যে-কোন শ্রমে, যে-কোন ত্যাগে এবং তিতিক্ষায় বাংলাভাষায় নিয়ে আসতে হবে, বাংলাদেশে গবেষক এবং গবেষণাগার সৃষ্টি করতেই হবে। এই পদ্ধতিতেই জ্ঞানের সামাজিকীকরণ করা হয়। এ পর্যন্ত এদিক দিয়ে আমাদের দেশ এক পা-ও অগ্রসর হয়নি।

আমাদের অর্থনীতির পণ্ডিতেরা হার্ভার্ড থেকে যে অর্থনীতি শিখে আসেন তার প্রয়োগ আমাদের দেশে সম্ভব নয়। অক্সফোর্ড থেকে যে সমাজতত্ত্বের পাঠ নিয়ে আসেন বাংলাদেশে তা অনেকটা মূল্যহীন। হার্ভার্ড-অক্সফোর্ডের শিক্ষা-দীক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি অনেকটা ইংরেজ মার্কিন সমাজের অভিজ্ঞতা, উদ্দেশ্য, শক্তি এবং বাস্তবতা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশে তা প্রয়োগ করা নানাকারণে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার ফলেই আমাদের পণ্ডিতেরা অনেক সময় বিদেশি বিদ্যার ভারবাহী পশুতে পরিণত হয়ে যান। যে বিদ্যার ফলিত প্রয়োগ নেই বা প্রয়োগের ক্ষেত্র অন্বেষণের ব্যাকুলতা নেই সে শিক্ষিত মানুষও এক ধরনের ভারবাহী পশু।

আমাদের দেশে অনেকদিন থেকে এ চলে আসছে এবং এখনো চলছে। তার কারণ এই শিক্ষিত শ্রেণীটিই নানাদিক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করেছে আমাদের সমাজকে। তারাই রাজনীতির হর্তাকর্তা, তারাই জাতির ভাগ্যবিধাতা। নিজেরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থেকে সমস্ত দেশের মানুষ মরুক, বাঁচুক, জাহান্নামে যাক কিংবা অশিক্ষিত থেকে যাক তাদের কিছু আসে যায় না। আপন পাওনাগণ্ডা পেলেই তারা খুশি। এই সন্তুষ্ট শ্রেণীর অবিমৃষ্যতার দরুনই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পেরেছে। জ্ঞানই শক্তি— এ অনুভূতি তাঁদের মন-মানসে কদাচিৎ জেগেছে। তাঁরা উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় ছিলেন, তাঁদের মাধ্যমেই বিদেশি শোষকেরা এ দেশের মানুষকে শোষণ করত এবং তাঁরা নিজেরাও প্রত্যক্ষভাবে শোষণ করতেন। তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনমত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি সবকিছুর উদ্ভব হতে পারে।

আমাদের মন-মানস এত দীর্ঘকাল ধরে দাসত্ব করেছে যে, তার হদিস আমরা নিজেরাও জানিনে। অসংখ্য বিদেশি জিনিসের মধ্যে কোনটা আমাদের জন্য

উপযুক্ত, কোনটা অনুপযুক্ত, কোনটা প্রয়োজন, কোনটা অপ্রয়োজন, কোনটা খেতে ভাল হবে, কোনটা খেতে খারাপ হবে, কোনটা করা উচিত, কোনটা করা উচিত নয় সে ব্যাপারে আমাদের ধারণা করার শক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। আমার জ্ঞানকে কতদূর সার্বজনীন করব, প্রযুক্তি বিদ্যার কি পরিমাণ প্রসার ঘটাব এবং ফলিত বিজ্ঞানের বিকাশ কতদূর নিশ্চিত করব তার উপরেই নির্ভর করছে আমাদের স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ। এসব যদি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে নামে স্বাধীন হলেও কার্যত আমাদের দাস থেকেই যেতে হবে। অপরের বাঁধাধরা চিন্তার মধ্যে আমাদের আবর্তিত হতে হবে। আমাদের নিজস্ব রুচি, নিজস্ব সংস্কৃতির যে নির্দিষ্ট কোন আকার আছে, তা কোনদিন দৃশ্যমান করে তুলতে পারব না। বাঙালি-সংস্কৃতি বলতে যদি আদ্যিকালের কোন সমাজের চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন থাকি বা তা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করি তাহলে আমরা সভ্য মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হতে পারব না। ইতিহাসের ধারায় বাঙালি আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে সবকিছুকে স্বীকার করে নিয়ে, মেনে নিয়ে এই বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীর অপরাপর দেশের সঙ্গে তাল রেখে আমাদের মাটি জল হাওয়া যে আমাদের চরিত্রকে একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে তৈরি করেছে, সেটি ফুটিয়ে তুলতে পারাটাই হবে আমাদের যথার্থ মৌলিকতার স্ফুরণ এবং সেটাই হবে আমাদের যথার্থ বাঙালিয়ানা।

আজ এই দাস্য মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তা নইলে আমাদের স্বাধীনতা মিথ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু এই মানসিক দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাজটা হৈ হৈ করে হওয়ার কথা নয়। এতে প্রয়োজন সুন্দরতম ধৈর্য, মহত্তম সাহস, তীক্ষ্ণতম মেধা এবং প্রচণ্ড কূলছাপানো ভালবাসা, যার স্পর্শে আমাদের জনগণের কুঁকড়ে যাওয়া মানসিক প্রত্যঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগবে এবং সাহস ফণা মেলবে।

আমাদের সমাজের দিকে তাকালে একই সঙ্গে লজ্জা, ঘৃণা, এবং অসহায়তা বোধ না করে উপায় নেই। এই যুগে মানুষ চাঁদে গেছে, সমুদ্রের তলায় ডুবেছে, ক্ষ্যাপা নদীর মাজায় বন্ধনী পরিয়ে ঊষর মরুভূমিকে শস্য-শ্যামলা করেছে। নিষ্প্রাণ কঠিন আবরণ উপড়ে মানুষের কত কীর্তি, কত সম্মিলিত প্রয়াস, কত অসাধ্য সাধনের কাহিনী আমরা শুনে পাশ ফিরে ঘুমোই। অথচ আমরাও মানুষ। আমাদেরও হাত-পা-মাথা সব আছে। আমরাও সমাজে বাস করি। আমাদের রাষ্ট্র আছে, সরকার আছে। তবু আমাদের মানুষ হয়েও পশুর মত জীবন কাটাতে হয়। আমরা গতর খাটিয়ে উৎপাদন করতে পারিনে, মাথা খেলিয়ে আবিষ্কার করতে পারিনে, বুক প্রসারিত করে ভাবতে পারিনে। আমাদের এই দেশে আমরা হাত-পা যুক্ত মানুষ হয়েও বিকলাঙ্গ। চোখের সামনে আমাদের কত কিছু ঘটে যাচ্ছে, কত নতুন নতুন আবিষ্কারে সমৃদ্ধ হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার, সন্ধানীর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বিজলির রেখার মত কত তত্ত্ব এবং তথ্য ঝিলিক দিয়ে ধরা পড়ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই বিরাট যজ্ঞে আমাদের কোন স্থান নেই। সমাজ ভেঙে সমাজ গড়ার এই মহান শক্তিমন্ত ক্রীড়ায় আমরা

নীরব দর্শকও নই। নতুন সংগ্রামী মানবতার ললাটে বিজয়-মুকুট পরাবার কাজে এক পা এগোই তিন পা পিছিয়ে যাই।

আমাদের সমাজে দৈব এবং দুর্দৈব রাজত্ব করছে। প্রবল পক্ষ দুর্বল পক্ষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। গোটা দেশব্যাপী বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে অশ্রুপাত করছে। দয়া, মানবতা, প্রেম, করুণা এসব শব্দ এখন অন্তর্নিহিত ব্যাঞ্জনা হারিয়ে ফেলেছে। শঠতা, মিথ্যাচার এবং প্রবঞ্চনা এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলধন। তামসিক প্রবৃত্তির পরিচর্যা এ দেশের ধর্মীয় কর্তব্যের অঙ্গীভূত বিষয়। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এ দেশের নৈত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রবল পক্ষের স্থূল অসহিষ্ণু সাম্প্রদায়িকতা এবং দুর্বল পক্ষের নিষ্ক্রিয় বিদেশে সহানুভূতি যাঞ্চাকারী সাম্প্রদায়িকতা এবং দেশের ঐতিহ্যিক সম্পত্তি। আবার প্রবল পক্ষ এবং দুর্বল পক্ষ, হিন্দু-মুসলমান দুই-ই মিলে দুর্বলতর পক্ষ মগ, হাজং, গারো, চাকমা প্রভৃতি সব উপজাতিদের বুকের ওপর চেপে বসে আছে। আমাদের এই দেশে ধর্মের নামে রায়ট করে। জ্ঞানের নামে পণ্ডিত নামধারী মানুষেরা চাকরি করে, সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের নামে কবি-সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল মানুষরা চাতুরালী করে। রাজনীতির নামে লোক ঠকায়। কুসংস্কার মানুষের মনে মনে বন রচনা করেছে। কাপালিক প্রবৃত্তির গোঁড়ায় জল ঢেলে, সার দিয়ে রাজনীতির সেনাপতিবৃন্দ খেয়াঘাট পার হবার জন্য নিত্যনতুন চকচকে কৌশল রচনা করেন। হয়ত তারা নির্বাচনের খেয়া খুব ধুমধাম করে পার হয়ে যাবেন। কিন্তু তারপর? তারপরও তো বাংলাদেশে মানুষ থাকবে। সে মানুষদের কি হবে? যাদের দেখে প্রাচীনযুগে চর্যাপদের কবি বলেছিলেন, হাড়িতে ভাত নেই, তাই নিত্য উপবাস করতে হয় এবং মধ্যযুগে চণ্ডী-মঙ্গলের কবি বলেছেন, শিশু কাঁদে ওদনের তরে, বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগ যুগপৎভাবে অবস্থান করছে। এখনো হাঁড়িতে ভাত থাকে না, গেরস্থ নিত্যি উপোস দেয়, এখনো শিশু এক ফোঁটা দুধের জন্য আছালি-পিছালি করে। সেই চাষা, সেই লাঙল, সেই বলদ, সেই সংস্কার, সেই ক্ষুধা, সেই রোগ, সেই অভাব, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর বাংলাদেশের ললাটের অক্ষয় লিখনের মত অটুট হয়ে আছে। সব পর্যায়ক্রমে একের পর এক দর্শন দিয়ে যায়। বন্যা জলোচ্ছাস এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঝড়-ঝঞ্ঝা ঘর-দোর তছনছ করে ফেলে। বনের পশুরাও অনেক ভদ্র জীবনযাপন করে। তারপরেও বাংলাদেশের মানুষ বেঁচে থাকে। তাদের জীবনীশক্তি এত শক্ত। বাংলাদেশের নারীসমাজের কথা কয়ে লাভ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীবৃন্দ বাংলাদেশের নারীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ করে চোখের জল ফেলেছিলেন। এখন চোখের জলও ফুরিয়ে গেছে। তবু সে সহিষ্ণুতায় বাঙালি নারীর স্বামী-পুত্রের সংসার রক্ষা করে, সন্তান ধারণ করে এবং রোগ-শোক মহামারীর আক্রমণ এড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখে সন্তান তা পারমাণবিক বিদ্যার চাইতেও দুরূহ এবং জটিল সাধনার বলেই সম্ভব। নারীমুক্তি, নারী জাগরণ, নারী আন্দোলন ইত্যাদি সব শব্দ কিষাণের কুটিরে, জেলে, তাঁতি, ছুতোর, কামারের ভেঙে পড়া আটচালায় কেমন ইংরেজি শোনায় না?

অনেকগুলো অভুক্ত সন্তান যে রকম করে জননীর স্তনের বোঁটা আকর্ষণ করে মারামারি কামড়াকামড়ি করে, কিন্তু কারো পেট ভরে না, তেমনি আদ্যিকালের উৎপাদন পদ্ধতি অনুসারে আদ্যিকালের যন্ত্রপাতি নিয়ে কোটি কোটি মানুষ জমির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। কারো ক্ষুধা মেটে না। এত মানুষের পেটের ভাত যোগাবার ক্ষমতা জমির নেই। তাই মানুষ আত্মধ্বংসী কলহে রত হয়। কিন্তু মানুষ যাবে কোথায়? আমাদের দেশে কল নেই, কারখানা নেই, বিশ্বজোড়া আমাদের কারবার তেজারতি কিছু নেই। অদূর ভবিষ্যতে যে হবে তার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই আমাদের জাতীয় পেশা ভিক্ষা। 'ফরেন এডে'র দিকে আমরা হা-পিত্যেশ করে চেয়ে থাকি। বিদেশি সাহায্য খেয়ে খেয়ে আমাদের হজমশক্তি অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এক দেশের ভিক্ষা নেয়ার পর আরেক দেশের দিকে হাত বাড়িয়ে বাঙালি কাঙালি প্রবাদের সার্থকতা প্রমাণ করি। সেই বিদেশি সাহায্য আমাদের দেশের অতি খাওয়া লোকেরা উদরসাৎ করে, অভুক্তদের কাছে পৌঁছায় না। আমাদের জাতীয় মূলধন হতাশা। বেশি খাওয়া এবং একেবারে না খাওয়ার হতাশায় পীড়নে আমাদের সমাজ উত্থান শক্তিহীন। আমাদের সমাজে অফুরন্ত শক্তি এবং অনন্ত সম্ভাবনার আধার অমৃতের পুত্র, অমৃতের সহোদর মানুষের জীবনই সবচাইতে ঘৃণিত, অবহেলিত এবং অনিশ্চিত। সর্বক্ষেত্রে জীবন লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং নিগৃহীত হচ্ছে। পৃথিবীর কোন দেশে মানুষ এমনি করে তারই ভাই মানুষের হাতে মার খায়? মার খেয়ে সহ্য করে? পৃথিবীর কোন দেশে মানুষ শুভবুদ্ধির প্রতি এমন কঠিন ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করে? পৃথিবীর কোন দেশে মানুষের অধিকার মানুষ এমনি করে হরণ করে? পৃথিবীর কোন দেশে মানুষের ভবিষ্যতের আশার মুকুল এমনি করে ঝরে যায়? অকাল জীবনতরু মরে যায়? কল্পনার পাখির পাখা অচল হয়? যদি কোন দেশে হয় সে আমাদের দেশ— আমাদের প্রিয় কবি কল্পচোখে যার রূপ দেখে গান বেঁধেছেন সোনার বাংলা...। দুনিয়ার সবকিছুর অদল-বদল হয়ে গেছে। দেশে দেশে পালা বদলের পালা সূচিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের সোনার বাংলা বালুচরে আটকে পড়া নায়ের মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। রাজা এসেছে, রাজা গিয়েছে। কত আন্দোলন গতিবেগ সঞ্চয় করে জলস্তম্ভের মত ফুলে ফুলে উঠল। কত নেতা এলেন-গেলেন, কত আশা-উদ্যম, স্বপ্ন-সাধনার অপচয় হল কিন্তু মানুষের ভাগ্য ফিরল না— এমনি দেশে আমরা বাস করি। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়। অন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে শাসকদল টিকে থাকে আবার অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেই বিরোধীদল ক্ষমতা দখল করে। যতই ভাবি অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ে মুষ্টিমেয় মানুষের এই ছিনিমিনি খেলা তার বুঝি কোন অবসান নেই।

শেষ পর্যন্ত কি ভিখারিই থেকে যাব? আমরা কী রাজনীতিতে প্রজ্ঞা এবং ভালবাসার বদলে ফাঁকিবাজিই করে যাব? সরকারের নামে নির্যাতনই চলবে এ দেশে? বিজ্ঞানের নামে বিদেশের সেকেন্ডহ্যান্ড যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ক্যানভাসার সৃষ্টি হবে? সামাজিকতার নামে তামসিক বৃত্তির চর্চা করব? সাহিত্যের নামে বাজে কথার আড়ত বানাব? লোকহিতের নামে জুয়াচুরি করব? এক অদ্ভুত দেশে আমরা বাস করি। যে

দেশের মানুষের সাবালক মস্তিষ্কের ফসল বিজ্ঞান এসেছে অনেকদিন আগে। কিন্তু মানুষের অন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে আমাদের দেশে ব্যর্থ হয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান এসেছে বিলাসের উপকরণ হিসেবে, শোষণের হাতিয়ার হিসেবে। আমাদের দেশের জীবন সুখী এবং সুন্দর করার বদলে হতশ্রী এবং হতাশায় ভরিয়ে তুলেছে। আধুনিক মানববাদী শিক্ষা আমাদের দেশে এসেছে আমলা সৃষ্টির ফুঁস মন্তর হয়ে। পৃথিবীর অত্যগ্রসর সামাজিক বিপ্লব এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের আগ্নেয় চেতনা আমাদের দেশের ঘাটে এসে তুকতাক বশীকরণ বিদ্যার আকার ধারণ করেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের জ্ঞানী-গুণীজন, কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষক-সাংবাদিকদের মন এসবে মোটেই খোঁচায় না। প্রতিটি সরকারের আমলে সকলে তাকে ঠুকে বলেন, খোদার দুনিয়ার এই অংশ আপনার সুশাসনে বহাল তবিয়তে চলছে। সমাজের তলা পর্যন্ত অবলোকন করে সারবান কিছু বলেছেন, বা লিখেছেন এমন মানুষ আমাদের সমাজে নেই বললেই চলে। যাঁদের ভাবার দায়িত্ব, তাঁদের ভাবনাযন্ত্র বিকল। প্রয়োজন কতদূর, ঘা কত বড় সে বিষয়ে কোন অনুভূতি নেই। একটি জাতি তার প্রয়োজন, অপ্রয়োজন, অজ্ঞতা, মূর্খতা ইত্যাদি নিয়ে ভাবতেই যদি না পারে তার কিসের গণতন্ত্র? গালভরা নাম দিলে তো আর সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। ভিক্ষাজীবী পুঁজিবাদ, ভিক্ষাজীবী পরাধীনতা আর ভিক্ষানির্ভর সমাজতন্ত্রে পার্থক্যটা কোথায়? সমাজতন্ত্রের মূলকথা মানুষকে ভেতর থেকে আত্মশক্তিতে আস্থাশীল করা, সৃজনীশক্তিতে এবং সহযোগিতায় বিশ্বাস করা। মানুষের সৃষ্ট সমস্ত কৃত্রিম বিভেদকে গুঁড়িয়ে ফেলে মানুষে মানুষে মিলনের পথ প্রশস্ত করা; সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মানুষী সত্তা যা সভ্যতার প্রাণবস্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এবং আপন ক্ষেত্রে স্থিত করা। বাংলাদেশে সে প্রক্রিয়াটি কি শুরু হয়েছে? বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে বলা হচ্ছে, হাঁ শুরু হয়েছে। কিন্তু তাও অন্যান্য দেশের অন্ধ অনুকরণ করে বলা হচ্ছে। তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সংযোগ নেই।

সমাজতন্ত্রের কবি কই? ভাবুক কই? চিত্রকর কোথায়? কোথায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বিনাশকারী কুসুমসদৃশ কোমল বজ্রাদপি কঠোর মানবপ্রেমিক সংগ্রামী? কোথায় আত্মপর ভেদহীন জ্ঞানমিশ্রিত কর্মীর বাহিনী? এসব কিছুই নেই— তবু সংবিধানের ঘোষণাতে সমাজতন্ত্র এসে যাবে— সে ভারি আজব কথা। আজকের এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের মানুষদের একটি মাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। সে যেখানে যে দেশকে ভালবাসে, সংস্কৃতি ভালবাসে, মানুষ ভালবাসে, জ্ঞান ভালবাসে; সকলে মিলে জ্ঞানের ভবিষ্যৎ, মানুষের সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ এবং দেশের ভবিষ্যৎ সুন্দরভাবে রচনা করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। কতকগুলো বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা নেয়া প্রয়োজন। জ্ঞান মানবজীবনকে সুন্দর করে বলেই আকাঙ্ক্ষিত। সংস্কৃতিতে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন বাজে বলেই বরণীয়। একটা দেশের আধারেই জ্ঞানের প্রসার, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, মানুষের উন্নতি হতে পারে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিতেও দেশের কল্পনা করা যায়। কিন্তু এ পর্যন্ত পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় এ জাতীয় প্রমাণ মেলে না। আন্তর্জাতিক সাহায্যের

ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে আমাদের ভাগ্য বদলানো সম্ভব নয়। আমাদের দাঁড়াতে হবে নিজের মেরুদণ্ডের ওপর, তাকাতে হবে নিজেদের দিকে, অনুসরণ করতে হবে নিজেদের সৃজনীশক্তিকে, কাজে লাগাতে হবে দেশের মানুষকে, জাগাতে হবে ঘুমন্ত শক্তি এবং প্রতিভাকে। বড়জোর বিদেশ থেকে প্রেরণা পেতে পারি, দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হতে পারি, কিছু উপকরণও আনতে পারি। আমাদের দেশে আমরাই সব। যা কিছু করার আমরাই করব।

সমস্ত কিছুর একটা ভিত্তি, একটা অবলম্বন প্রয়োজন। বাংলাদেশের যে নতুন সংস্কৃতির রূপরেখা আভাসিত হয়ে উঠেছে, সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের জনগণের নতুন একটি সংস্কৃতি ক্ষেত্রের দিগন্ত উন্মোচন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে— তার বস্তুভিত্তি কি? সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং অন্যান্য সুকুমার কলা অনুকূল পরিবেশ না পেলে গড়ে উঠতে পারে না। আশা করতে দোষ নেই, বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে তেমন একটা পরিবেশ তৈরি হবে। কঠোর বাস্তবের দিকে না তাকিয়ে শুধুমাত্র আশাবাদ দিয়ে কোথাও কিছু ভাল কাজ হয়েছে তেমন প্রমাণ নেই। আমাদেরও বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন এসেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে এরকম দাঁড়ায়, বাস্তব অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সোজাসুজি না তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

সংস্কৃতির বাহন পত্র-পত্রিকা এবং নানারকমের সাময়িকী। আজকে বাংলাদেশে বলতে গেলে কোন পত্র-পত্রিকা নেই যাতে তীব্র জীবনাবেগ, গভীর প্রাণস্পন্দন, পরিণত চিন্তা কিংবা জনগণের কল্যাণ ভাবনার কোন চিহ্ন ধারণ করে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। তার ফলশ্রুতি এই হয়েছে, আমাদের এই দেশে মতামতের, ভাবের, অনুভূতির এবং জ্ঞানের চলাচল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। পণ্ডিতসমাজ একেবারে সমাজের সঙ্গে বাস্তব সংযোগহীন হয়ে পড়েছে। আর পরিণত বুদ্ধি, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং প্রগাঢ় জ্ঞানের অভিভাবকত্বে যে নতুন চিন্তার উন্মেষ হয়, প্রবীণের সস্নেহ প্রশ্রয়ে, স্বচ্ছ সমালোচনায় তরুণ তার সাধনার যে সার্থকতা অনুভব করে, তা একেবারেই হচ্ছে না। পণ্ডিতেরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তরুণরা কোন একটা লক্ষ্য ঠিক করতে পারছেন না বলে অনেক ক্ষেত্রে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারেন না। আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলো সাময়িকপত্র থাকলে পণ্ডিতেরা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারতেন না। তাঁদেরকে নেমে আসতে হত, নানান বিতর্কের সম্মুখীন হতে হত, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক নানা প্রশ্নে মতামত রাখতে হত। পণ্ডিতবর্গের মতামতের ওপর নির্ভর করে গোটা সমাজে তর্কের তুফান ছুটত। জাতির মানসহ্রদে ঢেউয়ের পর ঢেউ খেলে যেত। এই দ্বন্দ্বে আমাদের সংস্কৃতির ভারজীর্ণ অংশ খসে পড়ত। শুধু প্রাণটুকু তরুণদের মন-প্রাণ নাচিয়ে তুলত। তারা কল্যাণের, সুন্দরের, সত্যের পথে হেলায় দুরূহ সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারতেন।

পাকিস্তান আমলে ঔপনিবেশিক সরকার চাইত না বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার প্রসার হোক, বাঙালি সৃজনশীল কর্মে আত্মনিয়োগ করুক। তা করলে ভয় ছিল,

বাঙালি শিল্প-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-ইতিহাসে তার জাতির মানসযাত্রার ভঙ্গিটির সঙ্গে পরিচিত হলে একদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। এই আশঙ্কাবশত তারা বাঙালির সাংস্কৃতিক বিকাশ নানান দিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। সেই কারণে পাকিস্তানি আমলে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিধর্মী কোন সাময়িকপত্রের জন্ম হয়নি। 'সমকাল' জাতীয় যে দুয়েকটা সাময়িকপত্রের দান এ দেশের সংস্কৃতির বিকাশে স্মরণীয় তাও কোনদিন পাকিস্তানি সরকারের আরোপিত বিধি-নিষেধের পরিপন্থী কোন চিন্তা-ভাবনা করতে পারেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কি তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বাংলার সব রকমের অগ্রগতির বিষয় স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে বিচার বিবেচনা করলে দেখতে পাব বহতা নদীর মত একটা না একটা সাময়িকপত্র জনমতকে শিক্ষিত করছে, নতুন চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করছে, নতুন প্রতিভা সৃজন করছে। বাংলার সংস্কৃতির, রাজনীতির, সাহিত্য-বিজ্ঞানের যাঁরা বরেণ্য পুরুষ বলে আমরা মনে করি, এই সকল সাময়িকপত্র না থাকলে তাদের কারো জন্ম হত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। উনবিংশ শতাব্দীর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'বঙ্গ দর্শন', 'প্রবাসী' থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের 'কল্লোল', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা বাদ দিলে দেখতে পাব, যাঁদের দানে বাঙালি সমাজ উর্বরা হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা-সাহিত্য, রাজনীতিতে এসেছে বেগ, এই সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোর পেছনে না তাকালে তাদের জন্ম সম্ভব হত না।

সাময়িক পত্র-পত্রিকা বহতা নদীর মত আর সামাজিকভাবে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের আলোচনা আলো-বাতাসের মতই প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গেছে নতুন যুগের সূচনা হওয়ার সময়ে, নতুন চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করার সময়ে, নতুন সমাজ নির্মাণ করার প্রাক্কালে সমমনা মানুষেরা পরস্পর মিলিত হয়ে, একে-অপরের গুণাবলির তারিফ করেছেন, দোষ দেখিয়ে দিচ্ছেন, পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করছেন, একই লক্ষ্যে কাজ করার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করছেন। অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়ে বাঙালি সমাজের উনবিংশ শতাব্দীর কথাই ধরা যাক। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা' থেকে ব্রাহ্মধর্মের সূত্রপাত। এই ব্রাহ্মধর্মের সংবৃদ্ধির কারণ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুমেলায়'ই উত্তরকালে নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রূপ এবং আকার পেয়েছে। এমনকি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময়েও বাংলাদেশের জেলায় জেলায় নানা সাংস্কৃতিক সম্মেলন হত। সেসব সম্মেলনে নানা জাতীয় সমস্যার বিষয় অত্যন্ত আন্তরিকতাসহকারে হিতৈষণার বাণী গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। সারা দেশে জ্ঞান-বিদ্যাচর্চার একটা হাওয়া আপনার থেকেই সৃষ্টি হত।

কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে সে রকম কোন কিছুই করা হয়নি। মাঝে মধ্যে কবিদের সম্মেলন, সাহিত্যিকদের অনুষ্ঠানের সংবাদকাগজে দেখা যায়। সেগুলো

ব্যয়বহুল হোটেলে অথবা জনগণের দুরধিগম্য অন্যকোন স্থানে। এই জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে লেখক-সাহিত্যিকেরা সমাজে প্রমাণ করতে চান তাঁরাও দামি লোক। কিন্তু যে মনোবৃত্তির কারণে গোটা দেশ এবং দেশের মানুষের দিকে পিঠ দিয়ে এই ধরনের সভার আয়োজন করা হয় তা অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাই নিন্দনীয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কাগমারীতে একটা সাহিত্য সম্মেলনের কথা শুনেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ের পরিসরে আর ঐ জাতীয় সভা বা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়নি।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ পড়বেন কি পড়বেন না, বর্ণমালার সংস্কার হবে কি হবে না ইত্যাদি বিষয়েও পণ্ডিতজনেরা সব ক্ষুদ্র আকারে হলেও নিজেরা একত্রিত হয়েছেন, মতামত রেখেছেন এবং গোটা জাতির কাছে এই গ্রহণ-বর্জনের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো আত্মরক্ষামূলক, আত্মবিকাশের কিছু নেই। সামরিক সরকারকে খুশি করার জন্য সরকারি উদ্যোগে অনেক সভা-সমিতি হয়েছে, সেগুলোতে আমাদের সংস্কৃতির বিরোধী ব্যক্তিবৃন্দই বক্তা এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন। জনগণ ওসব উদ্যোগ আয়োজনকে সব সময়ে ঘৃণার চোখেই দেখেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উচিত ছিল নানাবিষয়ে অনেকগুলো সাময়িকপত্রের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু তা হচ্ছে না, বিনিময়ে কোলকাতার পত্র-পত্রিকা এসে আমাদের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। আমরা কোলকাতার পত্র-পত্রিকা আসার বিরোধী নই। কিন্তু কোলকাতার পত্র-পত্রিকা আমাদের বাজারে এই একাধিপত্য মারাত্মক। তার দুটি কারণ। প্রথমত, কোলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলোতে যে ধরনের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ পায় এবং যে ধরনের সমাজ আদর্শের ছবি তুলে ধরে, সে ধরনের সমাজ আমাদের জনগণের স্বার্থবিরোধী। তাই এক ভাষা-ভাষী অঞ্চল হলেও আমাদের সমস্যা এবং পশ্চিম-বাংলার সমস্যার ধরনটি এক নয়। দ্বিতীয়ত, ওদেশের সব পত্র-পত্রিকা ব্যাপক হারে আমাদের দেশে আসতে থাকলে আমাদের দেশে সাময়িকপত্রের জন্ম এবং বিকাশ অনেক কারণে বিঘ্নিত হবে। আমাদের প্রতিভাবান এবং প্রতিশ্রুতিবান লেখক-সাহিত্যিকেরা পূর্ব-সংস্কারের বশে কোলকাতার কাগজে লেখা প্রকাশ করবেন এবং কোলকাতার কাগজগুলো বাজার রাখার কারণ হিসেবে কিছুসংখ্যক লেখকের লেখা প্রকাশ করবেন। তাঁর ফল দাঁড়াবে আমাদের দেশে চিন্তাসমৃদ্ধ, সৃষ্টিধর্মী কাগজের প্রকাশ বিলম্বিত হবে। আমাদের সব সমস্যা তো আর কোলকাতার কাগজে আলোচিত হতে পারে না, কারণ কোলকাতার নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। আমাদের সাময়িকী আমাদের নিজেদের জন্ম দিতে হবে এবং আমাদের লেখক নিজেদের সৃষ্টি করতেই হবে। প্রথমদিকে হয়ত আমাদের লেখকেরা অপূর্ণ থেকে যাবেন। প্রচেষ্টা আন্তরিক এবং শক্তিমন্ত হলে সে অভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে। নবজন্মের সময় সবদেশে তো এমন হয়েছে।

কিন্তু কোলকাতার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান, মতের বিনিময় পুরোপুরি চালু রাখা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতার যে সমস্ত কাগজ যেমন 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার', 'যুগান্তর', 'জলসা' ইত্যাদি আমাদের দেশে ব্যাপক হারে চলছে, সেগুলোর দিকে সন্দেহের চোখে না তাকিয়ে উপায় নেই। কেননা সে

সকল কাগজের একমাত্র লক্ষ্য কাটতি। টাকা উপার্জন ছাড়া অন্যকোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু আমাদের দেশে একটি নতুন সমাজ আদর্শ, একটি নতুন সংস্কৃতি সৃজনের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শুধু লোকরঞ্জনের অভিপ্রায়ে যে সকল কাগজ, সেগুলো বেশি পড়লে আমাদের জনগণের চেতনা থিতিয়ে যাবে। একইভাবে বিদেশি যে সকল যৌন পত্র-পত্রিকা, হালকা গোয়েন্দা বই আমাদের দেশে আসে সেগুলোর প্রসারও রোধ করতে হবে। ভাবতে অবাক লাগে বিজ্ঞানের জার্নাল, দর্শনের বই আমাদের বই বিক্রেতারা আনে না, আনে নোংরা বই।

সরকারের ওপর নির্ভর করে বিশেষ লাভ হবে মনে হচ্ছে না। কারণ সরকার ইতোমধ্যে যে সকল নীতি-নির্ধারণ করেছেন, তাতে নতুন চিন্তার প্রসারের স্থান নেই বললেই চলে। সরকার এমনভাবে প্রেস-ট্রাস্টের কাগজগুলো, রেডিও-টেলিভিশন এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণ করছেন তাতে স্বাধীন চিন্তা যা সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যের প্রাণবস্তু তার কোন স্থান নেই। সুতরাং সে সকল পত্র-পত্রিকা থেকে জাতির জন্য মঙ্গলকর কিছু বেরিয়ে আসবে আশা করা অবান্তর। তেমনি সরকারি উদ্যোগে যে সকল সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাতে নতুন সংস্কৃতি সৃজনের উত্তাপ বিকিরণের বদলে তোষামোদ এবং আমলাতান্ত্রিকতাই প্রাধান্য পাচ্ছে। কিন্তু সরকার তো আর দেশ নয়। এ সরকার খারাপ করলে টিকতে পারবেন না। জনগণ নতুন সরকার আনবেন। সুতরাং জনগণেরই দায়িত্ব সাময়িকপত্র প্রকাশ এবং ঘন ঘন সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঘরোয়া বৈঠক ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা এবং সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করা।

আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা করছি। আমাদের সবদিকে উদ্ভাবনীশক্তির উদ্বোধনের বদলে আমরা অপরের অনুকরণ করে আত্মপ্রবঞ্চনা করছি। ভাল জিনিস অনুকরণ করার মধ্যে দোষের কিছু নেই, কিন্তু অন্ধ অনুকরণটা কি কখনো ভাল? যে সমাজে আমাদের পিতৃপুরুষেরা জীবন অতিবাহিত করেছেন, যে সমাজে পাকিস্তানি একনায়কেরা চুটিয়ে রাজত্ব করেছে তার কাঠামোটা তো ভেঙে গেছে। যে মূল চিন্তার উপর আমাদের সমাজকে জোর করে স্থির রাখা হয়েছিল তা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। এখন আমাদের নতুন মূলচিন্তা সৃষ্টি করার এবং সে অনুসারে গোটা সমাজকে ঢালাই করার সময়। এখন কথা দাঁড়াল যে নতুন সমাজ সৃজনের তাগিদ সমাজের গভীর থেকে সঞ্চারিত হয়েছে, গণমানুষের জীবনের দাবি যাকে প্রায় অবশ্যকরণীয়ের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে এবং যা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অহং বা 'হিস্ট্রিক ইগোর' অভ্যুদয়ের শামিল তার দিকে মনোযোগ দেব না কি বিদেশের দিকে তাকিয়ে তাদের সাফল্যে আত্মহারা হয়ে আনন্দে বগল বাজাব, সেটা স্থির করা আমাদের মৌলিক এবং প্রাথমিক কর্তব্য। রাশিয়া, আমেরিকার মানুষ চাঁদে গেছে, রাশিয়ার শ্রমিকরা জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে মেহনতি মানুষের নেতৃত্বে একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ নির্মাণ করেছে। তেমনি করেছে অপরাপর সমাজতন্ত্রী

দেশের মানুষ। এসব সংবাদে আমাদের জন্য শুভ সংবাদ বয়ে এনেছে। মানুষ আত্মবিশ্বাসে উদ্ভাবনীশক্তির ব্যবহার করতে পারলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, গ্রহান্তরেও যাত্রা করতে পারে। যারা চাঁদে গেছে তারাও মানুষ— আমাদেরই স্বজাতি। তাদের বিজয়ে আনন্দিত হওয়ার অর্থ হল, যেহেতু আমরাও মানুষ, চেষ্টা করলে হয়ত আমরাও কোনদিন দুরূহ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারব। তেমনি শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ে আমরা আনন্দিত হই এই কারণে, আমাদের মত যেসব দেশে দৈব দুর্দৈব রাজত্ব করত, মুষ্টিমেয় মানুষ সমাজের অধিকাংশ মানুষকে শাসন এবং শোষণ করত, জনগণ তাদের দুঃখ-দুর্দশাকে বিধিলিপি মনে করে অপমান আর লাঞ্ছনা সহ্য করত, তারা একযোগে দাড়িয়ে শোষক শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজেরাই মালিক হয়েছে সব কিছুর এবং সে সঙ্গে শোষক শ্রেণীর পোষিত বিশ্বাস সংস্কার সব ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে মানুষের বাস্তবজীবনের সাথে সম্পর্কিত বিশ্বাস এবং ধারণাকে সমাজের মর্মকেন্দ্রে স্থান দিয়েছে। এই দৃষ্টান্তে আমাদের আনন্দিত এবং উৎসাহিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ আমাদের দেশের মানুষ যদি চায় তারাও অনুরূপ আরেকটি বিপ্লব আমাদের দেশে সম্পন্ন করতে পারে। যেহেতু সামাজিক বিপ্লব সমাজবিজ্ঞানের এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয়, নিপীড়িত শ্রেণী যদি বিপ্লব সাধন করতে চায়, তাহলে অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে বিপ্লবের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আমাদের দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য হওয়া উচিত আমাদের জনগণের মধ্যে ইতিহাসের এই গতিধারাটির বোধ চাড়িয়ে দেয়া এবং যে সকল সংস্কার বিশ্বাস ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথে বাধা রচনা করে, সে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করবে কি করে, তার বিষয়ে ওয়াকেফহাল করা। মানুষের বোধকে উন্নত করা, রুচিকে পরিশীলিত করা, সংগ্রামী মানবতার প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাশীল এবং কায়িক, মানসিক শ্রমের প্রতি যত্নশীল করে তোলাই এ পর্যায়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাজ।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কোন কোন বুদ্ধিজীবীকে বলা হয় আমেরিকার মানুষ, কাউকে রাশিয়ার, কেউ চীনের, কেউ ভারতের এবং কেউবা পাকিস্তানের। এদের অনেকের সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া যায় দালাল। শুধু অর্থের জন্যই বিদেশি শক্তির দালালি করে। কিন্তু সকলে এই হীন অর্থে দালাল নন। যদি বা দালালি করেন, সে সম্বন্ধে নিজেরাও বিশেষ সচেতন নন। কারণ তাঁরা মানুষের মুক্তির আদর্শে বিশ্বাসী। স্থূল লোভের কারণে বিদেশি শক্তির হয়ে কাজ করেন, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

তাঁদের অনেকে অন্ধভাবে চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সবকিছুকে এ কারণে সমর্থন করেন যে, ওসব দেশে সমাজ এমন করে ঢালাই করে ফেলেছে জনগণ, সেখানে মানুষে মানুষে সমতার আদর্শ অনেকাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই মুগ্ধতাই তাঁদের অন্ধতার কারণ। সেখানে মানুষে মানুষে সমতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু তাতেও ভেবে দেখলে আমাদের পুলকিত হওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের কাছে সবচেয়ে যেটা প্রত্যক্ষ, যেটা খাঁটি সে হল,

আমাদের দেশ এবং দেশের মানুষ। এই দেশ বহির্ভূত মানসিক আনুগত্যের চাইতে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। খিলাফত আন্দোলনের সময়ে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা একাট্টা হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তুর্কির খলিফার রাজত্ব রক্ষা করার দাবিতে। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, গোটা খেলাফতের ব্যাপারটাই ছিল অবৈজ্ঞানিক, দেশ বহির্ভূত এবং না-ধর্মী আন্দোলন। কার্যকালে দেখা গেল খালিফাকে খেদিয়ে দেশের বের করে দিয়ে মোস্তাফা কামাল পাশা এক নবযুগের সূচনা করলেন। সে সময়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে মুসলমানেরা যেমন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীর দিকে তাকিয়ে থাকতেন, তেমনিভাবে প্রগতিশীল বলে কথিত বুদ্ধিজীবীরা সমাজতান্ত্রিক দেশসসমূহের রাজধানীগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। যদিও এই দুই মোহমুগ্ধতার মধ্যে কিছুটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে।

অনেকে ভেবে দেখতে রাজি নন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সমাজতন্ত্রের প্রচারের চাইতে আরো বেশি কিছু সমস্যা রয়েছে। তাদের খেয়ে-পরে বাঁচতে হয়, গৃহ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে হয়, অপরের সঙ্গে কারবার তেজারতি করতে হয় এবং তদুপরি তাদের পররাষ্ট্রনীতি বলে একটা যে জিনিস আছে সে বিষয়ে আদৌ ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। আজকের সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের পররাষ্ট্রনীতির কথাই ধরা যাক। দুটি দেশের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে এমন অনেক কিছু রয়েছে যার সঙ্গে জারদের এবং চীনা সম্রাটদের অনুসৃত নীতির সঙ্গে মিল বর্তমান। তাদের আমরা যতদূর সমাজতন্ত্রের প্রসার-প্রচারের বন্ধু মনে করি, আসলে তাঁরা ততটা নয়। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে ও-সমস্ত দেশ জাতীয় স্বার্থকেই সব সময়ে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী এ বিষয়টি বুঝতে চান না, বড়লোকেরা গরিব অহংকারী আত্মীয়ের মত, তাঁরা সমাজতান্ত্রিক দেশের সমর্থক সে গর্বে দেশের মাটিতে পা ফেলেন না। এঁদের জন্য দুঃখ করা যায়, করুণা করা যায়। কিন্তু ওই বিদেশাভিমুখিতা যদি ব্যাপক হয় তাহলে আমাদের দেশের সমাজ পরিবর্তনের কাজটি বিলম্বিত হবে। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশের যে সংস্কৃতি তা সে সকল দেশের সমাজবাস্তবতার ফসল। তারা সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি সমাজের মানুষকেই তার নিজের সমাজ পরিবর্তন করে গড়তে হয় নিজেদের সংস্কৃতি। যা কিছু আমরা রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে সৃষ্টি করিনি, তাতে আমাদের অধিকার নেই। এই সংস্কৃতিতে অধিকারবোধটি গভীর নয় বলেই আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী নিজের দেশের ইতিহাসের বদলে চীন-রাশিয়ার ইতিহাস মুখস্থ করে। আসলে এটাও একটা পলায়নী মনোবৃত্তি, এ পলায়নী মনোবৃত্তি থেকেই রাজনীতি সংস্কৃতিতে লেজুড়বৃত্তির জন্ম। আগে আমরা লেজ না মাথা সেটিই ঠিক করতে হবে। মহামতি লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধু কথাটি সত্য। কিন্তু জার্মানির মানুষের তো তা দিয়ে কোন লাভ হয়নি। জার্মানিতে হিটলার এসে বসেছিল, জার্মানির শ্রমিকরা কিছুই করতে পারেনি। কারণ জার্মানির শ্রমিক শ্রেণী,

জার্মানির রাজনৈতিক আন্দোলন, জার্মান লেনিন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তেমনি আমাদেরও চীনা লুসুন কিংবা রাশিয়ান গর্কী দিয়ে চলবে না। আমাদের চাই নিজেদের মানুষ, আমাদের গণ-সংগ্রামের উত্তাপ থেকে জন্ম হবে যাদের।

আমাদের দেশে একটি রেনেসাঁর লক্ষণ জীবনের নানাক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে! কি সংস্কৃতি চিন্তায়, কি রাজনীতিতে এমন কতিপয় লক্ষণ এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরিয়েছে, পূর্বের যুগে তা ছিল সুপ্ত, চিন্তাবিদদের চিন্তা এবং স্বাপ্নিকদের স্বপ্নের বিষয়। যেহেতু পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে একটা নতুন সমাজ জন্ম নেয়ার বেদনা এখন তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হচ্ছে, তাই নতুন এবং পুরনোর মধ্যে সংঘাতটাও তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই সংঘাত শুধুমাত্র পাকিস্তানি সংস্কৃতি এবং পাকিস্তানি আমলের সমাজের সঙ্গে প্রাদেশিক বাঙালি সংস্কৃতি এবং কৃষিভিত্তিক অনগ্রসর বাঙালি সমাজের মধ্যে সীমিত নয়। আবহমানকালের ঐতিহ্যভিত্তিক স্থবির প্রায় বাঙালি সমাজ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আন্তর্জাতিকতা অভিমুখী বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির সংঘাতটাও বড় বেশি মুখিয়ে উঠেছে। শেষোক্ত সংঘাতটাকে বাঙালি জনগণের মুক্তি-সংগ্রামই সুনির্দিষ্ট আকার দান করেছে এবং সঞ্চারিত করেছে তাতে বেগ আর আবেগ। নিজেদের কিছুকে অস্বীকার না করে বিশ্বের যা কিছু মহীয়ান, গরীয়ান তা গ্রহণ করা এবং একই সঙ্গে নিজেদের যা কিছু অস্বাস্থ্যকর এবং জীবনবিরোধী মনে হবে, বর্জন করার মধ্যেই আমাদের জাতীয় রেনেসাঁর ভবিষ্যৎ সংগুপ্ত রয়েছে।

রেনেসাঁর মূলকথা মানুষের জীবন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের নতুন মূল্যায়ন এবং বাস্তবসম্মত উপায়ে কি ব্যক্তিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে স্বীকার করে নেয়া। এই কাজটিতেই প্রয়োজন জ্ঞানের। যখনই আমাদের সমাজে স্বীকৃতি পাবে— জ্ঞানই শক্তি, তখনই আমাদের দেশে সম্ভাবিত হয়ে উঠবে একটি রেনেসাঁ। সমাজের মুখ্য অংশে জ্ঞানের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বশর্ত একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক পদ্ধতি— যা ব্যক্তির অন্তর্জীবনের মহিমা এবং তার ব্যক্তিত্বের অনন্যতা স্বীকার করবে। একই সঙ্গে সামাজিক জীবনের দাবির প্রতি সচেতন থাকবে। এই ধরনের একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি সৃষ্টি করার কাজ সহজসাধ্য নয়— বিশেষত আমাদের এই দেশে। তার কারণ, আমাদের মানুষ অশিক্ষিত এবং কুশিক্ষিত, কুসংস্কারে তাদের চিন্তা-চেতনা আবদ্ধ। দেবতা পুজোর মত ব্যক্তি পুজোয় তারা অভ্যস্ত, সাম্প্রদায়িকভাবে ছাড়া অনেক চিন্তাও করতে পারেন না। সুতরাং এই দেশে মামুলি অর্থে যাকে আমরা রাজনীতি বলি, তাই দিয়ে মানুষের চরিত্রের আমূল সংস্কার সাধন করে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক পদ্ধতি নির্মাণ করার কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। 'ইজমের' পর 'ইজম' আসতে পারে। থিয়োরি আর থিয়োরির জঙ্গলে মানুষের চিন্তা-ভাবনা দিকচিহ্নহীন হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু মানুষের স্বভাব এবং চিন্তাধারা পরিবর্তন হবে না। মানুষের চিত্তবৃত্তির উন্নতি সাধন না করে, তার বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিশীলন না এনে, জ্ঞানের আগুন বুকে না জ্বালিয়ে তাকে একটা সমাজ ভেঙে আরেকটা সমাজ নির্মাণের কাজে ঠেলে দেয়াও একধরনের জবরদস্তি। শেষ পর্যন্ত

জবরদস্তি পশুর সমাজে চললেও মানুষের সমাজে চলে না। আজকে যে সকল রাজনৈতিক দল বোধ-বুদ্ধিহীন উপায়ে মানুষকে বিপ্লবের মায়াকাননের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে, তারা হয়ত মিথ্যা বলছে অথবা সমাজে জবরদস্তির রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে। দুটোই যে ব্যর্থ হবে, ব্যর্থ হতে বাধ্য, সে কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সামাজিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত সমাজের মুখ্য অংশে জ্ঞানের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষ তার পূর্ব-পুরুষ মানুষের কাছে যা কিছু পেয়েছে, তার মধ্যে জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই জ্ঞান প্রয়োগ করে তার যৌথ জীবন কিভাবে সে চালাবে এরকম চিন্তা এবং কর্মে সে যদি উদ্দীপিত হয়ে না ওঠে তাহলে কেন সে বিপ্লব করতে যাবে? মানুষ কি কখনো স্বেচ্ছায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে? কিন্তু মানুষের প্রচেষ্টা এবং চিন্তা সত্ত্বেও অনেক সময় নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতা কোথায় জানতে পারে না। লোকচরিত্রের রহস্য বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকে। তাই তারা ভাবে এক, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়ে যায় ভিন্ন, করতে চায় একরকম, কিন্তু হয়ে যায় অন্যরকম। তাই প্রতিটি সামাজিক বিপ্লবকে সুষ্ঠুভাবে প্রবাহিত করার জন্য মানুষের মননশীলতার পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়, তাই প্রতিটি রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে একটা মানসবিপ্লবেরও প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে মানসবিপ্লবের প্রয়োজন অমোঘ হয়ে উঠেছে, তার স্বরূপটি কি হবে সে বিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা নেয়া অবাস্তব হবে না আশা করি। পাকিস্তানি আমলে পাকিস্তানি শাসকেরা ইসলাম, মুসলমান, কোরআন এবং হাদিসের নামে এমন কতিপয় ধারণা চালু করেছিল, যেগুলোর পেছনে কোন বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি নেই। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি যে ধারণাগুলোও চলে যায়নি বরঞ্চ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে মানুষের মনের মধ্যে তার শিকড়ও অনেকদূর বিস্তৃত। সে ধারণাগুলোর অযৌক্তিকতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাতে হবে। সেগুলো যে জীবনবিরোধী, সভ্যতাবিরোধী— আমাদের জনগণের সামনে তা প্রমাণ করতে হবে। পাকিস্তানিদের দ্বারা প্রবর্তিত সমস্ত ধারণা অবৈজ্ঞানিক, সমস্ত আইন-কানুন পদ্ধতি তৎকালীন পূর্ব-বাংলাকে উপনিবেশ রাখার জন্যই প্রয়োগ করেছে এবং যা মানুষের মনে গভীর ছাপ রেখেছে, তার অশুভ প্রভাব থেকে মানুষের মন এবং চেতনাকে সৃষ্টিশীল উপায়ে মুক্ত করতে হবে। আবার যারা সনাতন বাঙালিয়ানার বড়াই করেন, কোম জীবনের গুণগান করেন, অনগ্রসর সামন্তভিত্তিক কৃষি সভ্যতার ঢিলে-ঢালা মন্থর জীবনের মূল্য চিন্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারাও বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির গতিকে পশ্চাৎমুখী করতে চান। তার অর্থ হল, বাঙালির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা, বাংলাদেশও যে ভূগোলের একটা চিহ্নিত অংশ সে সত্যের অপলাপ করা, বাংলার জনগণ যে পৃথিবীর জনগণের একটা ভগ্নাংশ, এই দিবালোকের মত সত্যকে অস্বীকার করা। বস্তুত আমাদের মন-মানসে বর্তমানে দুই ধরনের অন্ধতা বর্তমান। একটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক আরোপিত অন্ধতা, অন্যটা স্বেচ্ছা অন্ধতা। আমাদের একশ্রেণীর

বুদ্ধিজীবী এরকম বুঝিয়ে থাকেন যে বাংলাভাষা এবং সংস্কৃতির উৎকর্ষ যা হওয়ার ব্রিটিশ আমলে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের সাধনায় হয়ে গেছে. বাংলা-সাহিত্যের যতটুকু শ্রীবৃদ্ধি পশ্চিম-বাংলায় হয়েছে, তার বাইরে একচুল অগ্রসর হওয়ার সামর্থ্যও নেই। তারা ঠিক একথা স্পষ্টভাবে বলেন না, কিন্তু যে মানসিকতা দিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, বিদ্যাসাগর এবং সংস্কৃতির অত্যন্ত বরেণ্য পুরুষদের বিচার করেন, তা অনেকটা এই রকম। এই অর্থহীন অতীতচারিতা ভবিষ্যৎ থেকে আমাদের দৃষ্টি অতীতের দিকে নিয়ে যায় এবং শাসকশ্রেণী গদি রক্ষার কারণে এই অতীতচারিতাকেই অধিক মূল্য দিয়ে থাকে। তার দুটি কারণ। একদিকে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পারে— জাতীয় সংস্কৃতির চর্চা করছি, অন্যদিকে শাসন ত্রাসনও অব্যাহত রাখা যায়।

বাংলাদেশের নাড়ির স্পন্দনে আজ যা ধ্বনিত হচ্ছে, তার সুরটি আন্তর্জাতিক। তার নিজের যা আছে তাই নিয়ে বিশ্বের সামনে তাঁকে দাঁড়াতে হবে। তাতে পাকিস্তানি সমাজ বা বাংলার কৃষিনির্ভর সামন্ত সমাজের কোন স্থান যদি থাকে, থাকবে স্মৃতি হিসেবে, কখনো তা প্রধান ধারা নয়। তার প্রধান ধারাটি হবে এ দেশীয় হয়েও আন্তর্দেশীয়, বাংলাদেশের মানুষের হয়েও হবে সর্ব মানুষের। এই ধারাটি এখন প্রমত্তা পদ্মার মত ফুলে ফুলে উঠার কথা— এবং এই ধারাস্রোতে অবগাহিত হয়ে বাংলার এই অংশে জন্ম নেবে নতুনকালের রবীন্দ্রনাথ, নতুন কালের বিদ্যাসাগর, নতুন কালের জগদীশচন্দ্র বসু এবং নতুন কালের নজরুল ইসলাম।

